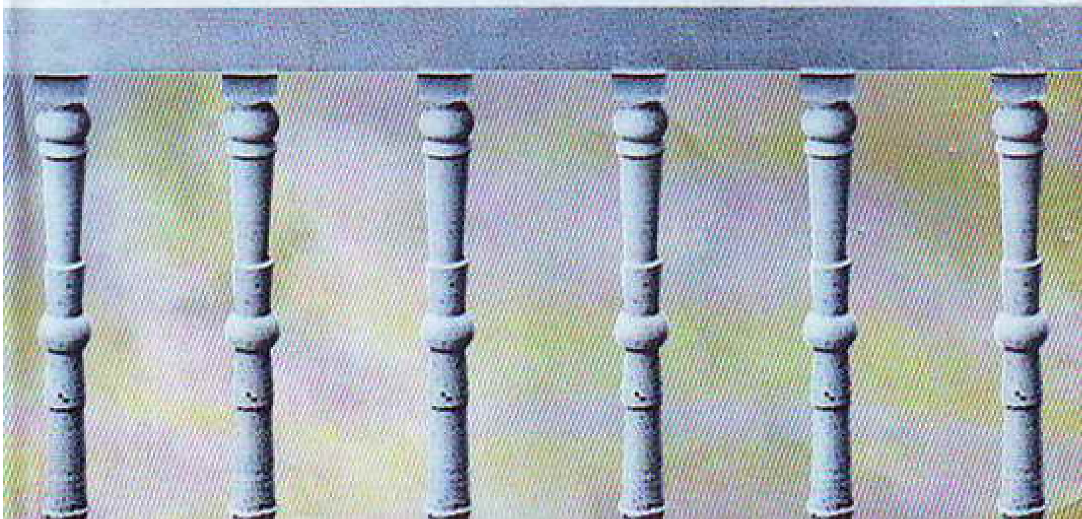
ভালোবাসা মন্দবাসা

আনিসুল হক







কলাবাগান লেকসার্কাস লেনের দোতালা বাড়িটা পূর্বমুখী। সকালবেলার রোদ সামনের কৃষ্ণচূড়া ও জারুল গাছের পাতার ফাঁক গলে এসে পড়েছে বাড়ির বারান্দায়, জানালার পর্দায়। ঢাকা শহরে এখনও পাখি আছে—কাক ছাড়াও, চড়ুই পাখি আর বুলবুলি। কয়েকটা চড়ুই বারান্দায় হুটোপুটি খেলছে।

নিচতলার বারান্দায় বসে অগ্রহায়ণ মাসের সকালের রোদ পোহাচ্ছেন বাড়ির সবচেয়ে প্রবীণ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত মিনহাজুর রহমান। গৃহপরিচারিকা নুরি বারান্দা ঝাড়ু দিচ্ছে।

আমার চশমাটা তো দিলি না। যা চশমাটা দিয়া যা। মিনহাজুর রহমান সাহেব বললেন গৃহপরিচারিকা নুরিকে।

খাড়ান। আইনা দিতেছি। খাড়ান। নুরি বারান্দাটা ঝাড়ু দিতে দিতে বলল।

খাড়াব? আমি একা একা দাঁড়াতে পারি? মিনহাজুর রহমান বললেন। সত্যি তিনি একা একা দাঁড়াতে পারেন না। বুড়ো হয়ে গেছেন। নানা অসুখ-বিসুখ। চোখে কম দেখেন। আর নিজে নিজে চলাফেরা করতে পারেন না।

নুরি বলল, বইসাই থাকেন।

বসেই তো আছি।

তাই থাকেন। নুরি ঝাড়ু দেওয়া শেষ করে ঘরের ভেতরের দিকে যাচ্ছে।

চশমাটা দিয়া যাস কিন্তু।

চশমা আনতেই তো যাইতাছি। নুরি চলে গেল।

মিনহাজুর রহমানের স্ত্রী নুরজাহান বেগম ততক্ষণে অস্থির হয়ে গেছেন। একদণ্ডও তার তর সয় না। গলার রগ ফুলিয়ে তিনি চিৎকার

করতে লাগলেন, নুরি নুরি...

নুরি কাছে গেল। জি আম্মা।

নুরজাহান বেগম তারস্বরে বলে চললেন, এই নুরি, কতক্ষণ থেকে ডাকতেছি। ছিলি কই?

দাদাকে বারান্দায় দিয়া আইলাম।

দাদাকে বারান্দায় দিয়া আইলাম। দাদাকে বারান্দায় দিতে এতক্ষণ লাগে। চুলায় ডাইল সিদ্ধ দিছিস না। পানি শুকায়া মনে হয় পোড়া গন্ধ বার হইছে। যা দ্যাখ।

যাইতেছি। নুরি দৌড় ধরল।

মিনহাজুর রহমান বাইরের বারান্দায় বসেই আছেন। নুরি তাকে রোজ সকালে ধরে এনে রোদে বসায়। ১৩ বছরের নুরির এই জিনিসটা খুব আশ্চর্য লাগে। রোজ তাকে টবের বনসাইটা একবার রোদে দিতে হয়। আর রোদে দিতে হয় দাদাকে। গাছের সঙ্গে মানুষের মিল দেখা যায় একটা সময়ে এসে। মানুষ যখন বুড়া হয়।

মিনহাজুর রহমানের চশমা আনতে নুরি ভুলে গেছে।

মিনহাজুর রহমান বারান্দায় বসে থেকে বোঝার চেষ্টা করছেন কে যাচ্ছে, কে আসছে।

দরজায় শব্দ হলো। তিনি তার বার্ধক্যপীড়িত গলায় আওয়াজ তুললেন, কে যায়? কে রে? আঁকা? এই কে যায়? নুরি কথা বলে না ক্যান?

আমি পেপারের হকার। বিল নিতে আইছি। তার প্রশ্নের জবাবে শোনা গেল।

ও। বিল নিবা। আচ্ছা নাও। তা দেশের খবর কী? চোখে ঠিকমতো দেখি না তো। খবরের কাগজ পড়তে পারি না। আজকার কাগজটা আনছ?

হকার বলল, জি।

মিনহাজুর রহমান বললেন, হেডলাইনটা পড়ো তো শুনি।

জি!

হেডলাইনটা পড়ো।

কী কন, বুঝি না।

খবরের কাগজ বেচো, হেডলাইন বুঝো না।

আমার সময় নাই। আমি যাই।

হকার চলে যায়।

মিনহাজুর রহমান মনে করার চেষ্টা করেন, তার যেন কী দরকার? কী দরকার সেটাও তিনি মনে করতে পারেন না।

নিলুফার বেগম এই বাড়ির বড়বউ। মিনহাজুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। সকালবেলাটা তার কাটে মহাব্যস্ততায়। কারণ লেখাকে স্কুলে দিয়ে আসেন তিনিই। লেখার বয়স ৯, সে ক্লাস থ্রিতে পড়ে। তার বড়বোন আছে একটা, আঁকা, বয়স ১৫। আঁকার স্কুল শুরু হয় নয়টায়। আঁকা তবু একটু সময় পায়। কিন্তু লেখার স্কুল আটটায়। মোটেও সময় পাওয়া যায় না। নিলুফার বেগম দৌড়ে গেলেন মেয়েদের শোবার ঘরে। দুই মেয়ের জন্যে আলাদা ঘর। মেয়েদের ঘর বলে গোলাপি রঙের দেয়াল। নানা ধরনের স্টিকার দিয়ে বাচ্চারা ঘরটাকে অরণ্য বানিয়ে রেখেছে।

লেখা আর আঁকা পাশাপাশি শুয়ে আছে।

লেখা আম্মু ওঠো ওঠো। স্কুল যাবা না? আম্মু স্কুল যাবা না? নিলুফার ঠেলতে লাগলেন লেখাকে।

আঁকার ঘুম ভেঙে গেল। সে হাঁই তুলে বলল, এই লেখা ওঠ। রোজ তোকে তুলতে গিয়ে আম্মু আমাকে তোলে।

নিলুফার বললেন, তুমিও ওঠো। তোমারও তো ক্লাস আছে। নাকি নাই?

আঁকা বলল, আছে। সে তো নটায়। এই লেখা ওঠ।

লেখা খিল খিল করে হেসে উঠল।

আঁকা বলল, এই, হাসছিস কেন?

লেখা বালিশটা মুখে ধরে বলল, আমি জেগেই ছিলাম। তোমাকে তোলার জন্যে চুপ করে শুয়েছিলাম।

আঁকা নাকি সুরে বলল, আম্মু দ্যাখো। এই তুই কাল থেকে আমার সাথে থাকবি না। আম্মুর সাথে থাকবি।

লেখা বলল, আচ্ছা থাকব। একা একা থাকলে ঠিকই ভয় পেয়ে আমাকে ডাকবা।

আঁকা বলল, ইস কী আমার সাহসিনী জোয়ান অব আর্ক। উনি তো রাতে আমাকে পাহারা দিয়ে রাখেন।

ততক্ষণে নিলুফার লেখাকে ধরে নিয়ে বাথরুমে ঢোকালেন। লেখার

চুল আচড়ে দু বেনী করে জোর করে তার গালে দুটো জেলি মাখানো পাউরুটির স্লাইস ঢুকিয়ে দিয়ে ওকে কাপড়চোপড় পরালেন। তারপর ব্যাগে টিফিন ভরে পানির বোতলে পানি দিয়ে ওকে নিয়ে নিলুফার চললেন স্কুলে।

নুরজাহান বেগম ডাইনিং টেবিলে বসে পত্রিকা পড়ছেন। পত্রিকার বিনোদন পাতায় প্রতিদিন একটা করে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সকালবেলা পত্রিকা পেয়েই প্রথম তিনি ওই সাক্ষাৎকারটা পড়েন। নিলুফার লেখার কানে কানে বলল, দাদিকে খোদা হাফেজ বলো।

লেখা দাদির কাছে গিয়ে বলল, দাদি যাই।

নুরজাহান বেগম তার রিডিং গ্লাসের ওপর দিয়ে চোখ দুটো বের করে তাকালেন, বললেন, যাই না আসি।

লেখা বলল, আসি।

নিলুফার বলল, মা রোজ তোমাকে একই কথা শেখাতে হয়। কেন আসি বলো না।

লেখা তার দুই বেনি দুলিয়ে বলল, মিথ্যা কথা বলতে ভালো লাগে না। আমরা তো দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছি। আসছি না। কেন আসি বলব।

নুরজাহান বেগম বললেন, আরে পাকা মেয়ে।

ওরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরের বারান্দায় মিনহাজুর রহমান হেঁকেই চলেছেন, কে যায়।

লেখা বলল, আমি লেখা।

কই যাস। কলেজে? ওর দাদা বলল।

লেখা হেসে ফেলল। দাদুর কিচ্ছু মনে থাকে না। ইউনিভার্সিটিতে। সিঁড়িতে এক লাফে পা ফেলে সে বলল।

নিলুফার বললেন, বাবা। ও লেখা। ছোটটা।

মিনহাজুর রহমান বললেন, ছোটটা। ও কই যায়?

নিলুফার জবাব দিলেন, স্কুলে।

ওর দাদু তারিফের সুরে বললেন, ও বড় হয়ে গেছে তাই, না। স্কুলে যায়।

দাদু, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা আসি। অধৈর্য লেখা মার হাত ধরে টানতে টানতে বলল।

মিনহাজুর রহমান বললেন, আচ্ছা নুরি তো আমার চশমাটা দিয়ে গেল না।

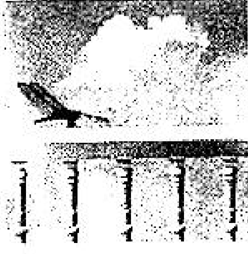
নিলুফার হেসে বললেন, বাবা চশমা তো আপনার চোখে।

মিনহাজুর রহমান বললেন, তাই নাকি। তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন?

নিলুফারের মনটা একটু দমে গেল। তার শ্বশুরের চোখ দুটো একেবারেই ডেবে যাচ্ছে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত তাকে। তার ননদ মেডিকালের ছাত্রী। সেই নিতে পারে। কই নেয় না তো।

তারা দ্রুত পা ফেলে নিচে চলে গেল।

গাড়ি রেডিই ছিল। ওরা উঠে পড়ল গাড়িতে।



নুরজাহান বেগম রেডিওর প্রভাতী অনুষ্ঠান ধারাবাহিক বকবকানি শুরু করলেন। নুরি নুরি, বউমা সব ছড়ায়া ছিটায়া চলে গেল। খাবার-দাবারগুলো একটু ঢেকে-টেকে যাবে না। উফ এই মেয়েটা। নুরি নুরি কী করিস? আয় এদিকে। তোর বড় চাচা খেতে আসবে না? তার নাশতা কই। সব ঠিক কর।

নুরি এগিয়ে এসে বলল, ভাবি তো সব ঠিক করে রেখে গেছে।

ভাবি ঠিক করে রেখে গেছে। ভাবি কোন জিনিসটা ঠিক করে রাখে। আমাকে তো সেই আসতেই হলো।

ঠিক করে রাখা জিনিসটা কোনোমতে নেড়ে চেড়ে নুরজাহান বেগম গেলেন তার বড়ছেলে মুনিরের কাছে। মুনির অফিসে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছে। তিনি দরজার চৌকাঠ ধরে বললেন, মুনির বাবা। খেতে আয়। তোর ব্রেকফাস্ট রেডি।

মুনির মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, আসছি মা। তুমি খেয়েছ?

নুরজাহান বেগম বললেন, আমি তোকে রেখে কোনোদিন খাই। আয় আয়।

মুনির গিয়ে নাশতার টেবিলে বসল। দাদিমা তার পাতে রুটি তুলে দিতে লাগলেন।

মুনির রুটির একটা টুকরো ছিঁড়ে নিতে নিতে বলল, তুমিও খাও মা। আঁকা খাবে না?

নুরজাহান বেগম বললেন, আঁকা তো এখনও খায় নাই। আঁকা, এই আঁকা।

আঁকার খেতে আসার কোনো নাম নাই। খেতে তার ভালো লাগে না। বিশেষ করে সকালের নাশতা। দু চোখের বিষ।

নিলুফার স্কুলে মেয়েকে নামিয়ে দিয়ে একা একা ফিরল।

মিনহাজুর রহমান বসেই আছেন বারান্দায়। কে যায়।

বাবা আমি নিলুফার। আপনার বউমা।

ও। ছোটটাকে স্কুলে দিয়ে আসলা।

জি।

নুরিকে একটু বলো তো চশমাটা দিয়ে যেতে।

নিলুফার দেখল, তাঁর চোখে চশমাটা যথারীতি আছে। সে করুণ একটা হাসি দিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। মুনির চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছে। হাতে খবরের কাগজ।

নিলুফার ঢুকতেই মুনির বলল, আঁকাকে বলো বের হতে।

নিলুফার গলা উঁচিয়ে ডাকল, আঁকা আঁকা। তোর বাবা বের হয়ে যাচ্ছে। বের হ।

আঁকা এল। মাথায় ক্লিপ বাঁধতে বাঁধতে—আমি রেডি। চলো বাবা।

নিলুফার বলল, কিছু তো খাস নাই। খেয়ে যা। এই তুমি একটা মিনিট দাঁড়াও।

মুনির ঘড়ি দেখে বলল, এক মিনিট না। তিন মিনিট দাঁড়াতে পারি। ১৮০ সেকেন্ড।

আঁকা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, না আমি এখন খাবো না।

নিলুফার বলল, কেন?

আঁকা বলল, আমার এখন খেতে ইচ্ছা করতেছে না।

নিলুফার বলল, খেতে ইচ্ছা করা না করা আবার কী রকম কথা? রোজ সময় মতো খেতে বসবি। ব্যাস।

আঁকা বলল, খাইবার ইচ্ছা হলো ক্ষুধা। ক্ষুধা না থাকলেও খেতে হবে? আমি যাই মা। সায়মারা আমার জন্যে ওয়েট করতেছে।

নিলুফার বলল, ওয়েট করতেছে করবে।

মুনির বলল, সায়মারা ওয়েট করছে তো কী হয়েছে। আর আঁকার যে বাবা ওয়েট করছে। নাও খেয়ে নাও।

আঁকা হতাশ ভঙ্গিতে বলল, কী খাবার। দাও। খেতে খেতে যাই।

নিলুফার বলল, রুটি রোল করে দেব।

আঁকা রাজি, দাও দাও।

নিলুফার একটা রুটিতে একটা ডিম অমলেট রোল করে দিলো। আঁকা

ওটা খেতে খেতে নামছে।

নিলুফার বলল, দাদির সাথে দেখা করে যা।

যাচ্ছি বলে আঁকা দাদির ঘরে উঁকি দিয়ে তাকে বাই বলে বাবার সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আঁকা আর মুনির বেরিয়ে যাচ্ছে। মিনহাজুর রহমান হাঁক ছাড়লেন, কে যায়?

বাবা আমি মুনির।

সাথে কে যায়?

দাদা আমি আঁকা।

কই যাস।

টিচারের কাছে। পড়তে।

আমার চশমাটা তো নুরি দিল না। কী যে করে মেয়েটা!

মুনির বলল, বাবা আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে অফিসের। যাই বাবা।

মিনহাজুর রহমান বললেন, আমার চশমাটা দিতে বলবি না।

মুনির বলল, চু। সময় তো নাই।

আঁকা বলল, এক সেকেন্ড বাবা। সে তাড়াতাড়ি দোরঘন্টি বাজাল। দুইবার। নুরি এলে তাকে বলল, এই দাদাকে চশমা এনে দে।

আঁকা গিয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠল ওর বাবার গাড়িতে।

মিনহাজুর রহমান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন. সবাই চলে যায়। 'কারো সময় নাই।

তার নাকের ডগাতেই চশমা রেখে নুরি বাড়ির ভেতরে চশমা চশমা করে গরুখোঁজা খুজতে লাগল।



মুনিরের ছোটভাই মোরশেদ ফিরল হাতে একটা ক্রিকেট ব্যাট আর ব্যাগে ক্রিকেটের প্যাড ট্যাড নিয়ে। সে একজন ক্রিকেটার। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই সে চলে গিয়েছিল মাঠে, প্রাকটিস করতে। বাসায় ফিরল পেটে একরাশ খিদে নিয়ে— ভাবি, ভাবি খিদা লাগছে। নাশতা কী আছে দাও তো।

নিলুফার এগিয়ে এল, আছে নাশতা। তুমি বসো।

মোরশেদ ব্যাট প্যাড ইত্যাদি রেখে হাতমুখ ধুচ্ছে।

নিলুফার নাশতা বাড়ছে। নুরজাহান এলেন। বললেন, এই সব তো ঠাণ্ডা। তোমরা তো জানোই মোরশেদ প্রাকটিস করতে গেছে। আসতে দেরি হবে। আগেই কেন পরাটা সেকে রাখলা। একটা কাজ বুদ্ধি করে করতে পার না।

নিলুফার বলল, আচ্ছা আমি ওভেনে গরম করে আনছি।

নুরজাহান বললেন, তাই তো করবা। পাইছ সব নানা যন্ত্রপাতি।

নিলুফার চট করে ওভেন চালিয়ে পরাটা ত্রিশ সেকেন্ড গরম করে আনল। মোরশেদ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ডাইনিঙে এসে খেতে বসল।

পরাটা মুখের মধ্যে চালান করে দিয়ে মোরশেদ বলল, ভাবি। আজকে খুব ভালো প্রাকটিস হইছে বুঝলা। প্রাকটিস ম্যাচ হইল। আমি থার্টি থ্রি। নট আউট।

নিলুফার বলল, এটা কি ভালো না খারাপ।

অবশ্যই ভালো। কারণ আর কেউ আমার চেয়ে বেশি করে নাই।

নিলুফার রান্নাঘরে ঢুকল চা করার জন্যে।

নুরজাহান এসে মোরশেদের পাশের চেয়ারে বসলেন— বউমাটার মাথায় বুদ্ধি শুদ্ধি নাই। সব পরাটা আগেই বানিয়ে রেখেছে। তোর আসতে

দেরি হয় জানে। তবু।

মোরশেদ বলল, বাদ দাও তো। একটা মহিলা আর কত করবে।

কত করবে মানে। কী করল?

নিলুফার এগিয়ে এল। তার হাতে একটা বাটিতে পাকা পেঁপের টুকরা। কমলাটে হলুদ।

মোরশেদ তাকে বলল, ভাবি তুমি খাইছ তো?

নিলুফার বলল, খেয়েছি ভাই। তুমি খাও। পেঁপের বাটি রেখে নিলুফার গেল রান্নাঘরে। পানি ফুটছে। চা বানিয়ে কাপে ঢালতে হবে।

নুরজাহান বেগম বললেন, আমি খেয়েছি কিনা জিজ্ঞেস করেছিস।

মোরশেদ ব্যস্ত হয়ে মার জন্যে থালা পাততে লাগল, খাও নাই? খাও খাও। তুমি যে মা কি!

মিতু ঘুম থেকে উঠল এতক্ষণে। সে সারারাত পড়েছে গতকাল। সামনে তার পরীক্ষা।

মিতু মুনির মোরশেদদের বোন।

সে পড়ে মেডিকেল কলেজে।

চোখে চশমা দিয়ে গ্রের আনাটমি পড়তে পড়তে সে এল এগিয়ে।

মিতু বলল, ভাবি, ভাবি চা বানাচ্ছ?

নিলুফার বলল, হ্যাঁ। খাবা এক কাপ?

মিতু বলল, সো কাইন্ড অফ ইউ।

নিলুফার বলল, দিচ্ছি বানিয়ে।

মোরশেদ বলল, মিতু রে। তোকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। কী করে খাবি বলতো বিয়ের পরে। এক কাপ চাও তো বানাতে পারিস না।

মিতু বই থেকে মুখ তুলে বলল, তোকে অতো ভাবতে হবে না। নিজেরটা ভাব। তুই কী করবি। ডিগ্রি পরীক্ষাটাও তো দিলি না।

মোরশেদ বলল, দ্যাখ। আমি ক্রিকেটার মানুষ। পড়াশোনাটা আমার জন্যে কোনো ম্যাটার করে না। আমি রান পাচ্ছি না পাচ্ছি না এটাই হলো ব্যাপার।

মিতু বলল, শচীন টেন্ডুলকারেরও তো একটা ডিগ্রি আছে।

মোরশেদ বলল, আরে কয়েকদিন পরে আমাকে তোর স্যার মোরশেদ হাসান বলে ডাকবি। রান পেলে সব পাব।

মিতু বলল, রান পাচ্ছিস তো। মা ওকে দুটো রান দাও।

নুরজাহান বেগম সত্যি সত্যি ছেলের পাতে দুটো মুরগির রান তুলে দিলেন।

নিলুফারের সকালটা যায় এই রকমই। ব্যস্ততায়। শাশুড়ির রাগ-রাগিনীভরা আলাপ শুনতে শুনতে সংসারের এটা ওটা সামলে। দুপুরবেলা সে স্কুলে যায় লেখাকে আনতে।

আজও তেমনি মা মেয়ে ফিরছে গাড়িতে। আঁকা আর মুনিরকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি বাসায় ফিরে আসে।

নিলুফার মেয়ের ক্লাস ডায়েরি চেক করতে করতে বলল, মা, আজ স্কুলে কী কী হলো বাবা?

লেখা বলল, আম্মু ওই যে এসে কম্পিটিশন, ওটা হলো।

কী রচনা লিখতে দিল?

আমার মা।

পারলি?

মিস বলেছে তোমাদের যার যা ইচ্ছা লিখ। আমার যা মনে হয়েছে আমি লিখেছি।

কী লিখলি? আমার মা পচা, এসব?

এ এ আমার মা বলে পচা। আমার আম্মু ভালো। ভালো লিখেছি।

আমার মা আমাকে মারে, লিখেছিস?

তুমি আমাকে মারো না তো। আদর করো।

এই যে মারলাম। মেয়ের গালে একটা চুমু দিয়ে নিলুফার বলল।

বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে আজকে। কয়েকদিন অসময়ে বৃষ্টি হলো। আজকের দিনটাকে মনে হচ্ছে এক্ষুনি মাজা কাঁসার থালা।

আম্মু, মিস কালকে ড্রয়িং বুক পার্ট টু নিয়ে যেতে বলেছে। চলো দোকানে চলো, কিনে নিয়ে যাই।

নিলুফার হাতব্যাগ খুলতে খুলতে বলল, দাঁড়া দেখি পার্টসে কত টাকা আছে? আচ্ছা চল। কাদের, বইয়ের দোকানগুলোর সামনে একটু রাখো।

কলাবাগানেই কতগুলো বইয়ের দোকান। ড্রাইভার গাড়ি রাখল বইয়ের দোকানের সামনে।

লেখা আর নিলুফার দোতলায় একটা বইয়ের দোকানে ঢুকল। দোকানটা বেশ বড়সড়। একজন দোকানিকে নিলুফার জিগ্যেস করল, ড্রয়িং বুক পার্ট টু আছে? দেখতে হবে বলে দোকানি আরেকদিকে চলে গেল।

আর লেখা একা একা মাটিতে রাখা বইয়ের স্তূপগুলো থেকে নিজের পছন্দের বই খুঁজতে লাগল।

এই সময় একজন তরুণী লেখার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, শোনো। তোমার নাম কী?

লেখা।

লেখা। খুব সুন্দর নাম।

থ্যাংক ইউ। তোমার নাম কী?

এলিসন।

খুব সুন্দর নাম।

তাই।

থ্যাংক ইউ বললে না। কেউ তোমার প্রশংসা করলে থ্যাংক ইউ বলবে। লেখা বলল।

ওমা তাই। তুমি একটা চমৎকার মেয়ে। তরুণী চমৎকৃত।

এলিসন বলল, থ্যাংক ইউ। চলো তোমাকে একটা কিছু কিনে দিই।

লেখা বলল, তোমার জিনিস আমি কেন নেব। অপরিচিত কারো জিনিস নিতে নাই।

তরুণীর চোখটা ছলছল করে উঠল। সে বলল, তুমি তোমার মার সঙ্গে এসেছ না?

হ্যাঁ।

তরুণী বলল, আমি তোমার খালা হই মা। আসো নাও। তোমার মা কিছুই বলবেন না।

তরুণী লেখাকে একটা বড় গ্লোব কিনে দিল। লেখা গ্লোবটা নিয়ে গেল মার কাছে, মা বই পেয়েছ?

নিলুফার বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। চলো যাই। এই তোর হাতে এটা কী? এটার দাম আমি দিতে পারব না। ফেরত দে।

দোকানি জানাল, ওটার দাম দেওয়া হয়ে গেছে।

নিলুফার বিস্মিত, কে দিল?

লেখা বলল, খালা দিয়েছেন। এলিসন খালা।

নিলুফার বলল, কী বলিস?

তার বুক কাঁপতে লাগল। সে দ্রুত লেখার হাত ধরে হাঁটতে লাগল চলে যাবার জন্যে।

লিজা দাঁড়া। এলিসন বলল।

নিলুফার একটু দাঁড়াল। তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। না সে দাঁড়াবে না। সে তাড়াতাড়ি লেখার হাত ধরে নিচে নেমে এল। গাড়িতে উঠল।

লেখা বলল, মা উনি কে?

নিলুফার বলল, কেউ না মা চলো।

উনি যে বললেন উনি খালা হন।

বড়দের আন্টি খালা এইসব বলে ডাকতে হয় মা।

ও। কিন্তু তুমি ওনাকে দেখে এভাবে দৌড়ে এলে কেন?

না দৌড়ে আসব কেন? দৌড়ে আসি নি তো।

নিলুফার লেখার দিকে তাকাচ্ছে না। সে জানালা দিয়ে রাস্তা দেখছে।

আজকের দিনটা খুব সুন্দর। বেশ কদিন পরে রোদ উঠেছে।

লেখা বলল, মা তোমার কী হয়েছে? মা তুমি কাঁদছ কেন?

নিলুফার বলল, না তো? মা কাঁদছি না তো। ওই দেখো রাস্তার পুলিশরা কী করছে!

কী করছে?

মা শোনো। এই গ্লোবটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি ফেরত দিয়ে দেব।

কেন? খালা তো দাম দিয়ে দিয়েছেন। দোকানদার ফেরত নেবে না।

আচ্ছা তাহলে এটা কে দিয়েছে দাদিকে বোলো না।

কেন?

দাদি শুনলে রাগ করবেন। কারণ বাইরের একজনের কাছ থেকে কেন তুমি একটা জিনিস নেবে। সেই জন্যে।

আচ্ছা। বলব না।

নুরজাহান বেগমের অস্থির অস্থির লাগছে। লেখাকে নিয়ে বউমা তো এখনও ফিরল না। এত দেরি তো কোনোদিনও হয় না।

নুরি তাকে জিগ্যেস করল, দাদি, এমুন করেন ক্যান?

কেমন?

এই যে একবার ঘরে ঢুকেন একবার বারান্দাত যান, ঘটনা কী?

লেখার তো এতো দেরি হয় না স্কুল থেকে আসতে। আজ এত...

জাম লাগছে দাদি। আমগো গেরামে গরমের সময় জামগাছে জাম ধরে, ডাহা শহরে সারা বছর...

মারব এক চড়... আমি মরি চিন্তায় চিন্তায়...

টুংটাং টুংটাং। কলিংবেল বেজে উঠল। নুরজাহান বেগম আর নুরি দুজনেই দৌড়ে গেল দরজা খুলতে।

দরজা খুলল। তরকারিওয়লা দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে, তরকারি নিবেন!

না। নুরজাহান বেগম ভীষণ রেগে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আবার কলবেল।

নুরজাহান বেগম খেপে গিয়ে ভাবলেন, যাই তরকারিওয়ালাটার গালে একটা চড় বসিয়ে দেই।

এইবার লেখাকে নিয়ে নিলুফার হাজির।

কী ব্যাপার বউমা, এত দেরি হল যে...? নুরজাহানের কণ্ঠে উদ্বেগ।

লেখার একটা ড্রয়িং বুক কালকে লাগবেই। সেটা কিনতে দোকানে গেলাম...



মিতু ফোনে। মোরশেদ এসেছে ফোন করতে। তার হাতে মোবাইল। সে মোবাইল থেকে নাম্বারটা বের করছে। মিতু বলে চলেছে, নারে সময় পাচ্ছি না। কালকে আমার কার্ড ফাইনাল না? গাউসিয়ায় কখন যাবো। শাড়িটাতে লেস লাগানো না হলে পরি কেমন করে?

মোরশেদ কাশি দিয়ে বলল, টেলিফোন জিনিসটা জরুরি খবর আদান প্রদানের জন্যে। এইসব শাড়ি লেস... কোনো মানে হয়?

মিতু বলছে, ওই কাপড়টায় ব্লক করতে দিছি। ওইখানে সস্তায় ব্লক করে দেয়।

মোরশেদ আবার কাশি দিয়ে বলল, শুনছিস। ফোনটা ছাড়। আমার একটা ইমার্জেন্সি কল আছে।

মিতু ফোনের রিসিভারটা চেপে ধরে বলল, এই কী হইছে? ফোন করবি?

মোরশেদ বলল, হ্যাঁ খুব জরুরি।

আমিও জরুরি কথা বলতেছি। তোরটা বেশি জরুরি হলে মোবাইল থেকে কর।

শাড়ি জামা এই সব জরুরি কথা না!

তুই আমার আলাপ ওভারহিয়ার করছিস?

ওভারহিয়ার করতে হয় না। এ ছাড়া তোদের আর কোনো আলাপ আছে?

আমি কালকের পরীক্ষার পড়া নিয়া আলাপ করতেছি। আমি তো তোর মতো ভেরেন্ডা ভাজি না। মেডিকালে পড়ি।

দেশে এখন প্রচুর ডাক্তার। আর একটা ডাক্তার না হলেও খুব বেশি আসবে যাবে না। কিন্তু দেশে একটাও ক্রিকেটার নাই। আমাদের অবশ্যই একটা ক্রিকেটার চাই। দেশের প্রেস্টিজ, নে সর।

যন্ত্রণা! এই কাকলি পরে কথা বলব। হ্যাঁ। বলে মিতু ফোন ছেড়ে দিয়ে গজর গজর করতে করতে চলে গেল।

মোরশেদ ফোনটা নিয়ে ডায়াল করে শুরু করল তার জরুরি কথা, হ্যালো। পিয়াল আছে। পিয়াল, কী করস? এমনিই ফোন করলাম আর কী। বুঝস না...

লেখা তার সদ্য পাওয়া গ্লোবটা দিয়ে খেলছে।

নুরজাহান বেগম বললেন, এই প্রথম তোর মা তোকে একটা ভালো জিনিস কিনে দিল। এটা দিয়ে ভূগোলের অনেক কিছু জানা যায়।

লেখা বলল, এটা মা কিনে দেয়নি।

তাহলে কে কিনে দিয়েছে?

সে তো তোমাকে বলা যাবে না।

বলা যাবে না মানে। মা নিষেধ করেছে?

হ্যাঁ।

কে দিল আমাকে বল।

তুমি আবার আম্মুকে বলে দেবে না তো?

না বলব না, বল।

আম্মুকে বকবে না তো!

না বকব না।

এলিসন খালা।

এলিসন খালা? নুরজাহানের মাথার ভেতরে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। এলিসন না নিলুফারের বোনের নাম? সেই বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ আছে নিলুফারের? থাকার তো কথা নয়। এ যে দেখছি কেঁচো খুঁড়তে কেউটে সাপ। দাঁড়াও। আমিও জানি কত ধানে কত চাল।

মাথা ঠান্ডা নুরজাহান বেগম। মাথা ঠাণ্ডা!

তিনি শান্ত মুখে গেলেন নিলুফারের কাছে।

বউমা। গ্লোবটা তো খুব সুন্দর। আমাদের বাড়িতে একটা গ্লোব ছিল বুঝলা। আব্বা সেইটা থেকে আমাদেরকে দেশ চেনাতেন। তা মা, লেখাকে গ্লোবটা কে কিনে দিয়েছে? তুমি?

আমি ছাড়া আর কে দেবে? নিলুফার মুখ শুকনো করে বলল।

আচ্ছা আচ্ছা। না মানে কোনোদিনও তো খেলনা ছাড়া কোনো

শিক্ষামূলক কিছু কিনে দিতে দেখি না তো তাই জিজ্ঞেস করলাম।

বইয়ের দোকানে গেছি। দেখে পছন্দ হলো। কিনে দিলাম।

ও, তাহলে ওর এলিসন খালা দেয়নি বলছ?

ও কথা কেন আসছে মা?

না। লেখাই বলছিল। জিজ্ঞেস করলাম কে দিয়েছে? বলল, এলিসন খালা। এটাও বলল, সেটা তোমাকে জানানো বারণ। বাচ্চাদের একটা ব্যাপার কি জানো, ওরা মিথ্যা বলতে পারে না। তুমি যতই ওকে মিথ্যাটা শেখাও। ও সত্য বলবেই...

না মানে আমি ঠিক জানি না। কে যেন ওকে খেলনাটা দিয়ে চলে গেছে আমি জিজ্ঞেস করলাম কে, বলল খালা। আমি ভাবলাম সব মহিলাই তো নিজেকে খালা বলে.. ও আর এমন কি আমি তাই আবার টাকাটা দিয়ে...

আবার মিথ্যা বলছ। তুমি সব জানো। ভেতরে ভেতরে তোমার বাবার বাড়ির লোকদের সাথে ঠিকই তুমি যোগাযোগ রাখো...

না মা এসব আপনি কী বলছেন...!

কী বলছি মানে। লেখা আমাকে সব বলেছে। তোমার নাম লিজা জানল কী করে। তোমার বোনের নাম এলিসন... ছি ছি ছি...

আমি জানি না, ও কার কাছে কী শুনেছে। আমার সাথে কারো দেখা হয়নি, কথাও হয়নি...

আবার মিথ্যা কথা...নুরজাহান বেগম চিৎকার করে উঠলেন। খবরদার কোনো কথা বলবে না...একটাও কথা না...

মিতু পাশের ঘরে বসে পরীক্ষার পড়া পড়ছিল। নুরজাহান বেগমের চিৎকারে তার মনোযোগের ব্যাঘাত ঘটল। সে উঠে এল এই ঘরে, কী হলো মা, তুমি কী শুরু করলা। তোমাদের জ্বালায় আমি কি একটু শান্তিমতো পড়তেও পারব না?

নুরজাহান বেগম বললেন, আমি আবার কী করলাম। তোর ভাবিকে জিজ্ঞেস কর।

মিতু বলল, কেন কী করল সে?

নুরজাহান বেগম কান্নার সুরে বলতে লাগলেন, কিছুই করেনি। সব দোষ আমার। তলে তলে ও ওর বাপের বাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখে তুই জানিস? ওর বোনের সাথে দেখা করেছে দোকানে গিয়ে...আগে থেকে সব

ঠিক করা ছিল...

মিতু বিস্মিত। কী বলো তুমি মা... ভাবি সত্যি...

নুরজাহান বেগম বললেন, আমি সত্যি বলছি না তো মিথ্যা বলছি

মিতু বলল, ভাবি তুমিও কম না... জানোই আমার পরীক্ষা... এর মধ্যে গেলে ঝগড়াঝাটি বাধাতে... তুমিও যেমন মাও তেমন। যে কোনো একটা ছুতায় একটা ঝগড়াঝাটি বাঁধানো চাইই।

নুরজাহান বেগম বললেন, আমি ঝগড়াঝাটি বাঁধাইছি....

বাঁধাইছই তো। আর তুমিও ভাবি। এতদিন পরে আবার বোনের সাথে দেখা করার দরকার পড়ল কী তোমার?

নিলুফার অসহায়ের মতো ওই ঘর থেকে চলে এল নিজেদের ঘরে। তার দুচোখ ভিজে আসছে। কতদিন পরে তার দেখা হয়েছে ছোটবোনটার সঙ্গে! একটা কথাও বলতে পারেনি সে। আর তারপরও কিনা এত কথা শুনতে হচ্ছে। তার ভাগ্যটা এত খারাপ কেন?

লেখা এতক্ষণে বুঝে গেছে কী মারাত্মক ভুলটাই না সে করেছে! তার এই ভুলের জন্যে এখন মা বকা খাচ্ছে। বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেছে। ঝগড়াঝাটি তার একদম ভালো লাগে না। তবু যে কেন এই বাসায় এইসব হয়। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একমনে গ্লোবটা ঘোরাতে লাগল।

নুরজাহান বেগম ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তিনি ফোন করলেন মুনিরকে। বাবা মুনির ... বলেই তিনি ফোনে কাঁদতে লাগলেন।

মুনির মা-অন্ত প্রাণ। সে অস্থির হয়ে উঠল—কী হইছে মা? বলো কী হইছে?

নুরজাহান বেগম নাক টেনে বললেন, না কিছু হয় নাই। সব আমার কপালের দোষ। আয় তারপর বলব।

আরে সমস্যাটা কী বলবা তো।

না কার বিরুদ্ধে কী বলব। উপর দিকে থুতু দিলে তো নিজের মুখেই থুতু পড়ে।

কে তোমাকে কী বলছে মা?

নুরজাহান বেগম আরেকটু শব্দ করে কাঁদলেন।

মুনির বলল, নিলুফার তোমাকে কিছু বলছে?

নুরজাহান নীরব হয়ে রইলেন।

কী বলছে বলো।

কী বলবে। সবই আমার কপাল। পেটে ছেলেকে ধরছিলাম। তাই আজকে বউয়ের মুখ থেকে কথা শুনতে হয়...

মা তুমি কেঁদো না তো। তুমি জানো কান্নাকাটি আমি সহ্য করতে পারি না।

নুরজাহান বেগম ফোন রেখে দিলেন।

একটু পরে মোরশেদ এল তার কাছে। মা তোমার কাছে কিছু টাকা হবে, এই ধরো শ পাঁচেক? মোরশেদ খেয়াল করল, মা কাঁদছেন। কী হইছে তোমার?

না কী হবে। তুই ভাত খাইছিস?

হ্যাঁ। খাইছি। তুমি খাও নাই।

আমার আবার খাওয়া? তুই খাইছিস তাইলেই হবে। মায়ের খোঁজ কে আর করে।

কেন খাও নাই কেন?

সে খোঁজ তোকে এখন না নিলেও চলবে।

সামথিং রং মনে হচ্ছে। চলো ভাত খাও চলো।

যা তো। যা এখান থেকে।

যাবো? বললে কিন্তু চলে যাবো। একদম।

কিছু একটা ঘটেছে। কী ঘটতে পারে?

কী আবার? মা নিশ্চয়ই ভাবির সঙ্গে রাগারাগি করেছেন। এইটা মার অনেক পুরানা রোগ। আজকে ঘটনা কী ঘটেছে, জানা দরকার।

মোরশেদ তার ভাবি নিলুফারের কাছে গেল। কী ব্যাপার ভাবি, মার হইছেটা কী?

নিলুফার বলল, না। কিছু হয় নি তো। আমাকে একটু বকাবকি করেছেন। ওনার তো কিছু হয় নাই।

তোমার উপরে রাগ। সেই রাগে ভাত খাচ্ছে না। মহিলা পারেও।

ওনাকে একটু বোঝাও। ওনার বাড়ি। ওনার ঘর। উনি কেন না খেয়ে থাকবেন।

তুমি বলছ?

বলছি। শোনে না।

আমার মনে হয় একবেলা না খেয়ে থাকা ভালো। ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্রেসার এসব হবে না। তুমি খাইছ তো?

খেয়েছি।

খাইছ। আচ্ছা ভালোই করছ। তোমার অবশ্য যে স্বাস্থ্য, ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্রেসার এইসবের কোনো চান্সই নাই। না খাইলে অবশ্য একবেলার চাল বাঁচত। থাকুক। সে আর কয় টাকা! মোরশেদ এই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনহাজুর রহমান শোবার ঘরে। তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি ফ্যানের নিচে বসে আছেন। আপন মনেই।

তার হাতে একটা রিমোট কন্ট্রোল কলিং বেলের সুইচ আছে। তিনি সেটার বোতামে চাপ দিলেন। পাখির গানের সুরে কলবেলটা বেজে উঠল।

নুরজাহান বেগম উঁকি দিলেন। তিনি ঝাঁঝাল গলায় বললেন, আবার কী হইল।

মিনহাজুর রহমান বললেন, একটু পানি খাবো।

খালি পানি পানি করো ক্যানো? পানি খাবা, আর বার বার বাথরুম যাবা। এত পানি খাওয়ার দরকার নাই। বলে তিনি ডাইনিংয়ে গিয়ে এক গ্লাস পানি ঢেলে আনলেন।

পানির গেলাস হাতে নিয়ে মিনহাজুর রহমান বললেন, তোমাকে এত কষ্ট করতে কে বলল। নুরিকে বললেই তো পারতা।

নুরজাহান বেগম উষ্মামিশ্রিত গলায় বললেন, নুরির অন্য কাজ আছে। এক পালা কাপড় ধুতে দিছে। ও কাচতেছে।

পানি খাওয়া হয়ে গেলে নুরজাহান বেগম গ্লাস নিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হলেন।

আবার বেল বাজালেন মিনহাজুর রহমান।

নুরজাহান বেগম গলা উঁচিয়ে বললেন, কী হলো?

বাথরুমে যাবো।

তোমাকে বললাম পানি খাওয়ার দরকার নাই। পারব না এখন তোমাকে ধরে আমি বাথরুমে নিয়ে যেতে। কষ্ট করে চেপে থাকো।

নুরজাহান বেগম রাগে গজরাতে গজরাতে আবার তার কাজে ফিরে গেলেন।

মিনহাজুর রহমান ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কি ঘরের ভেতরেই বাথরুম সারবেন নাকি? তিনি আবার বেল টিপলেন। নুরি বাথরুম থেকে সাবান

মাথা হাত নিয়ে বেরিয়ে এল। কী হইছে দাদা?

বাথরুমে যাবো।

চলেন। আমি ধরতেছি।

নুরি তার হুইল চেয়ার ঠেলে তাকে বাথরুমে নিয়ে গেল।

নিলুফারের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। সে এগিয়ে দেখল, মুনিরের ফোন। সে মোবাইল কানে দিয়ে বলল, হ্যালো...

নিলুফার।

হ্যাঁ বলো।

মার কী হয়েছে বলো তো।

কী হয়েছে?

ফোন করে কান্নাকাটি করল।

মাকেই জিজ্ঞাসা করো। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

মা তো কিছু বলে না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। তুমি বলো।

আমি কী বলব?

মা কেন কাঁদছে? তোমার সাথে কী হয়েছে?

আমার সাথে কিছু হয় নাই!

তোমার সাথে কিছু হয় নাই। তাইলে কাঁদছে কেন? তুমি কী বলেছ?

আমি কী বলব? উনিই তো কত কিছু বললেন। আবার উনিই কাঁদছেন নাকি।

কেন যে তোমরা একটু ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারো না। উনি বুড়ো মানুষ। একটু খানি অধৈর্য। তার সাথে তুমি মানিয়ে চলবে না?

আরে আমি তো কিছু বলি নাই...

কী রকম লাগে। নিলুফারের মনের আকাশে মেঘ জমে থাকে। অনেক মেঘ।

এই মেঘ আজকের নয়। অনেক পুরোনো।

কিন্তু সে মেঘে বর্ষণ হয় না। তাই মনের আকাশের ভার কখনও কমে না।

ধৈর্য্য, শুধু ধৈর্য্য ধরে টিকে আছি। মাটি কামড়ে ধরে পড়ে আছি। আর কত সহ্য করা যাবে। মানুষেরই তো মন।

আঁকা এল তার টিউশনি শেষ করে।

নুরি বলল, আপা আইছেন।

না আসি নাই। আঁকা গম্ভীর মুখে বলল।

আইছেন না?

তাইলে জিজ্ঞেস করতেছিস ক্যান?

আপা আছেন রঙ্গ লইয়া। বাসার পরিস্থিতি খারাপ।

কী হইছে?

জানি না। দাদি কান্দে। ওই দিকে চাচি কান্দে।

এই জন্যেই বাসায় আসতে ইচ্ছা করে না। ধেত্তেরি।

আসেন। আপনার ভাত রেডি কইরা রাখছি। খাইয়া লন।

আর ভাত খাওয়া। খিদা মিটে গেছে। যাই দেখে আসি।

এই দুনিয়ায় যে জিনিসটা আঁকার সবচেয়ে অপছন্দ, তা হলো বাসায় গণ্ডগোল। ঝগড়াঝাটি। মনোমালিন্য। মানুষ বাড়ি ফেরে শান্তির জন্যে। আর এই বাড়িতে ফিরতে হয় অশান্তির জন্যে।

আঁকা মার ঘরে গেল। দেখল মা কাঁদছেন।

আঁকা মুখভার করে বলল, মা কী হইছে?

নিলুফার অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করতে করতে বললেন, না কিছু হয় নাই তো। মারে তোর ভাত বাড়া আছে, খেয়ে নে।

তুমি খাইছ?

আমার কথা তো হচ্ছে না। তুই খা।

খুব খিদা লাগছিল। তুমি না খেলে খাবো না। থাক।

সে কী কথা, চল! খেতে চল।

চলো।

একটু তোর দাদির কাছে যা তো। দেখে আয় কী করে। মনে হয় খায়নি। যা ধরে এনে খাওয়া।

আচ্ছা যাচ্ছি।

নুরজাহান বেগম দরজা বন্ধ করে নিজের পাউরুটিতে জেলি মেখে খাচ্ছেন। আঁকা গিয়ে দরজায় টুক টুক শব্দ করতেই তিনি পাউরুটি আড়াল করে ফেলে কাঁদতে লাগলেন।

আঁকা ঘরে ঢুকল। কী হইছে দাদি?

নুরজাহান বেগম বললেন, না কী আর হবে? তার কান্নার জন্য কথা বিকৃত হয়ে গেল।

দুপুরে খাও নাই?

বুড়ো বয়সে আবার খাওয়া। যা বুবু। খেতে হবে না।

আমার খুবই খিদা পাইছে। তুমি না খেলে আমি খাবো না। চলো।

না না খাবো না।

এই সময় পাউরুটি আর জেলি আঁকার চোখে পড়ল। সে ভ্রু কুঁচকে বলল, আরে বুড়ি রে। পেটের খিদায় পাউরুটি খাইতেছে।

আমি খাচ্ছি না। তোর দাদা খেতে চাইল...

মিনহাজুর রহমান বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎই তিনি চোখ খুলে বললেন, আমি কখন খেতে চাইলাম। তুমিই না খাচ্ছ...

আঁকা বলল, চলো তো দাদি। সে দাদিকে টেনে নিয়ে গেল খাবার টেবিলে।

সন্ধ্যা ছয়টার মতো বাজে। বাইরের পৃথিবীতে এখনও কিছু আলো আছে। কিন্তু গা ঘেঁষা বিল্ডিং একের পর এক উঠে ঢাকা শহরের পাড়া-মহল্লা আর বসতবাড়ির ভেতরটুকুকে অন্ধকার করে ফেলেছে।

টেলিভিশনের চ্যানেলগুলোর বৈকালিক বাংলা ছায়াছবিগুলো খানিক আগে শেষ হয়েছে।

এমন সময় বেল দোরঘণ্টি বেজে উঠল বাসায়।

নুরজাহান বেগম তক্কে তক্কে ছিলেন। মুনির কখন আসবে! তিনি চিৎকার করে উঠলেন, নুরি নুরি... মুনির আসলে আমার কাছে আসতে বলবি।

নিলুফার তার ঘরে। সে কান খাড়া করে আছে। মুনিরের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মুনির বউয়ের ঘরে ঢোকার আগে ঘুরে গেল। সে মায়ের ঘরে যাচ্ছে। নিলুফার উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল। মুনির ওই ঘরে গেল!

মুনির নুরজাহান বেগমের ঘরেই আগে ঢুকল। কর্মক্লান্ত চেহারা। শার্ট পেছন দিকে প্যান্টের কোমর থেকে বেরিয়ে গেছে। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়েই বলল, কেমন আছ মা?

নুরজাহান বেগম মুখটা করুণ করে বললেন, আর আমার থাকা। বয়স হয়ে গেলে মেয়েমানুষ কখনও ভালো থাকে না। তিনি যে দীর্ঘশ্বাসটা ছাড়লেন, মাপলে সেটাই হতো পৃথিবীর দীর্ঘতম শ্বাস। গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এই শ্বাসের কথা লেখা হয়ে যেত!

মুনিরের মনটা দমে গেল। কী হয়েছে?

না হবে আর কি! তোর বউ। সে তো তলে তলে তার ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ রাখতেছে। আজকে গিয়া তার বোনের সাথে দেখা করে আসছে।

বলো কি!

হ্যাঁ!

তোমাকে কে বলল?

লেখার হাতে একটা গ্লোব। আমি বললাম কে দিল। সে বলে মা নিষেধ করেছে, বলা যাবে না। শেষে বলল...ওর এলিসন খালা দিয়েছে। কী রকম মেয়ে! আবার নিজের মেয়েকে শিখাইছে মিথ্যা বলতে। আবার সেইসব নিয়া কথা বলতে গেলেও আমারই দোষ।

তোমার দোষ আবার কে দিল?

দিতে হয় না। বুড়া বয়সে সব দোষ আপনাআপনিই ঘাড়ে চলে আসে।

না না। তোমার দোষ হবে কেন। আচ্ছা আমি দেখছি। তুমি মন খারাপ করে থেকো না।

মুনির এই ঘর ছেড়ে ধীর পায়ে নিজের শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

মুনির নিজের ঘরে গিয়ে দেখল, নিলুফারের মুখও ভারভার। সে আর কথা বাড়াল না। কাপড়চোপড় খুলে হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল নিলুফার চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

চা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে।

মুনির চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিল। বাহ্ চমৎকার চা হয়েছে! বিছানায় বসে আস্তে আস্তে বলল, বাসায় কী হয়েছে বলো তো। মা কি সব বলছিলেন।

নিলুফার বলল, মা বলে ফেলেছেন? তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করতেছ কেন?

কী হয়েছে সেটা জানতে চাই না। মা বুড়ো মানুষ। তার স্বামী অচল। একটু খিটখিটে মেজাজের তো হয়েছেন। একটু এডজাস্ট করে চলো আর কি!

তুমি আমাকে এসব বলতেছ কেন? আমি কী করছি? আমি তো মাকে কিছুই বলি নি।

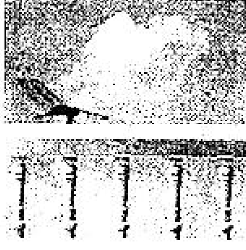
তুমি আবার ওই বাসার সাথে এতদিন পর যোগাযোগ করতে শুরু করছ নাকি?

এই প্রশ্ন তুমিও আমাকে করতেছো। আল্লাহ্‌ আমি এখন কই যাই!

অভিমানে নিলুফারের চোখ দুটো জলে ভিজে আসতে চাইছে।

মুনির হতাশস্বরে বলল, শোনো। সারাদিন গাধার খাটনি খেটে বাসায় আসি। তারপর বাসায় এসে যদি দেখি শান্তি নাই...ভালো লাগে বলো...

নিলুফারের খুব অভিমান হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীটার ওপরেই যেন সেই অভিমান গিয়ে পড়ছে।



আকাশে মেঘ জমে। আকাশেই সূর্য ঝলকায়, পূর্ণিমার চাঁদ দোল খায়। একটা যৌথ পরিবারে ছোটখাট বিষয় নিয়ে সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হয়। আবার বড় আনন্দের উপলক্ষের জোয়ারে সবাই ভাসতেও থাকে। তখন খুটখাট আওয়াজ হয় না, একেকজনের একেক বাজনার সম্মিলনে হয় অর্কেস্ট্রা।

লেখা গেছে দাদির কাছে– দাদি দাদি।

বল। নুরজাহান বেগম খবরের কাগজের রেসিপি পড়ছিলেন।

লেখা মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, কালকে আমাদের স্কুলে ফাংশান। তোমাকে যেতে হবে।

তুই কী করবি?

আমি? গান করব।

দাদি হেসে বললেন, তাহলে তো যেতেই হয়। যাবো। অবশ্যই যাবো। তোর মা নিয়ে যাবে তো।

হ্যাঁ। মা-ই তো আমাকে পাঠাল তোমাকে বলার জন্যে। বলল, যা, তুই বল, তাহলে না বলতে পারবে না।

কী পরে যেতে হবে?

কী পরে যেতে হবে মানে?

কী ড্রেস? তোদের স্কুল যাওয়ার নিয়ম-কানুন আছে না?

গার্জিয়ানরা আবার কী পরে যাবে! গার্জিয়ানদের জন্যেও ইউনিফরম লাগবে নাকি।

লাগতেও পারে। আজকালকার স্কুলগুলোর কত কত নিয়ম-কানুন।

যাও দাদি। কিচ্ছু লাগবে না। তুমি শাড়ি পরেই যাবা।

তাইলে ঠিক আছে।

তুমি কি ভাবছ তোমাকে স্কার্ট পরে যেতে হবে। বলে লেখা খিলখিল

করে হাসতে লাগল। নতুন দাঁত উঠেছে। হাসলে মেয়েটাকে যা সুন্দর লাগে। গালে টোল পড়ে।

নুরজাহান বেগম লেখার গালটা টিপে দিয়ে হেসে বললেন, হ্যাঁ সেই রকম ভাবছিলাম...

না। নুরজাহান বেগমকে স্কার্ট পরতে হলো না। তিনি পরিপাটি করে শাড়ি পরেন। চোখে চশমা লাগিয়ে তার পুত্রবধূ আর নাতনির সঙ্গে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

মিনহাজুর রহমান বারান্দায় বসা। কে যায়? এই কে যায়? তিনি যথারীতি জিগ্যেস করলেন।

দাদা আমি লেখা।

সাথে আর কে কে যায়?

মা আর দাদি।

তোর দাদি? কই যায়?

স্কুলে।

স্কুলে? তোর দাদি স্কুলে ভর্তি হয়েছে নাকি?

শোনো। আমি একটু লেখার স্কুলে যাচ্ছি। ওর স্কুলে আজকে একটা ফাংশান আছে।

তুমি স্কুলে ভর্তি হইছ নাকি?

আরে না। আমি আবার কোন স্কুলে ভর্তি হবো। আমার বয়স হইছে না।

কী আর এমন বয়স হইছে। তুমি আমার ছোট না?

নিলুফার বলল, বাবা। আমি নিলুফার। আপনার নাতির স্কুলে আজকে ফাংশান। বললেন, আপনি দোয়া করেন।

মিনহাজুর রহমান সাহেব, আচ্ছা দোয়া করব। অনেক দোয়া করব।

নিলুফার বলল, বাবা আমরা আসি। খোদা হাফেজ।

দাদাও বললেন, খোদা হাফেজ।

গাড়িতে বসে লেখা জিজ্ঞেস করল, দাদি, আমরা বলি খোদা হাফেজ। অনেকে যে বলে আল্লাহ হাফেজ!

দাদি বললেন, আমি জিনিসটা আমার বড়ভাইজানকে জিজ্ঞেস

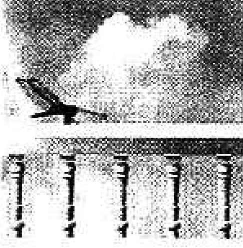
করছিলাম। উনি তো জ্ঞানী মানুষ। উনি বললেন, আল্লাহ্ যিনি, খোদাও তিনি। কাজেই খোদা হাফেজ বললে কোনো অসুবিধা নাই। খোদা হাফেজ আসলে ইরানি কালচার। ইরানি সুফি- সাধকরা এই দেশে এসে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন। আমরা তাদের কাছ থেকে এইটা শিখেছি।' খোদা ইরানি শব্দ। পারসি। আর আল্লাহ্ আরবি। কিন্তু আরব দেশে আল্লাহ হাফেজ, খোদা হাফেজ কোনোটাই প্রচলন নাই। ইসলামে দেখা হলে বা বিদায় নেবার সময় বলতে হয় আসসালামু আলাইকুম। এর মানে আপনার ওপরে শান্তি আসুক। এই কথাটাও খুব সুন্দর কথা। এখন কেউ যদি আরবি কালচার ফলো করতে চায়, সে বলবে, আসসালামু আলাইকুম। আর যদি কেউ পারসি কালচার ফলো করতে চায় বলবে খোদা হাফেজ। কিন্তু আল্লাহ হাফেজটা হলো জগাখিচুরি। যেমন আমরা কি গুড সকাল, বা শুভ মর্নিং বলি। বললে বলতে হবে, গুড মর্নিং। দুইটা মেশালে জিনিসটা জগাখিচুরি হয়। অনেকটা মাংসের ঝোলের সঙ্গে রসগোল্লা মেশানোর মতো। বড়ভাইজান বলেছেন, আসসালামু আলাইকুমও খুব ভালো কথা। এর মধ্যে কিন্তু কোথাও আল্লাহ বা খোদার কথা নাই। আছে শুধু শান্তির কথা। আর খোদা হাফেজ মানে আল্লাহ হেফাজতকারী। উনি হেফাজতে রাখবেন। এটাও মুসলমানদের জন্যে ভালো কথা। আমরা যখন নামাজের নিয়ত করি, তখন বাংলায় করারও বিধান আছে। আল্লাহ যদি বাংলায় নামাজের নিয়ত করাটা বোঝেন, তাহলে খোদা কেন সেটা বুঝবেন না? কাজেই খোদা হাফেজ না বলে আল্লাহ হাফেজ বলাটার দরকার পড়ে না। ভাইজান বলেছেন, বললে ভুল হয় না, বাহুল্য হয়।

লেখা বলল, বাহুল্য কী দাদি।

বাহুল্য, বাহুল্য, দাদি বলতে পারলেন না।

নিলুফার বলল, বাহুল্য হলো বেশি বেশি আর কি!

নিলুফার তাঁর শাশুড়ির কথাটা মন দিয়ে শুনছিল। শুনে সে অভিভূত। এই মহিলা এত সুন্দর করে বোঝাতে পারেন!



স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হচ্ছে। বাচ্চারা মঞ্চে উঠে একটা চমৎকার গান করল। সোলজার সোলজার উইল ইউ ম্যারি মি।

গানের শেষে আমার মা শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ। নিলুফারের বুক কাঁপছে। তার মেয়েও এই রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। সে কি কোনো পুরস্কার পাবে? তৃতীয় স্থান অধিকারীর নাম বলল, লেখা পেল না, দ্বিতীয় স্থানেও লেখা নেই, শেষে প্রথম পুরস্কার বিজয়ীর নামটা শুনে নিলুফারের তো জ্ঞান হারানোর জোগাড়। তার মেয়ে রচনায় ফার্স্ট হয়েছে।

লেখা মঞ্চে গিয়ে হেড মিসট্রেসের কাছ থেকে পুরস্কার নিল।

ইস, একটা ক্যামেরা সঙ্গে আনলেই তো হতো। এই ছবিটা তোলা উচিত ছিল না?

স্কুল থেকে অবশ্য তুলেছে। পরে ডিসপ্লে করবে। সেখান থেকে ছবি বাছাই করে প্রিন্টের অর্ডার দিলেই ছবি করে দেবে। অসুবিধা নাই।

পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়েছে একটা বড়সড় কাপ। কেন যে স্কুল থেকে পুরস্কার হিসাবে বই দেওয়া হয় না।

সেই কাপ হাতে পেয়ে লেখা সবাইকে অস্থির করে মারতে লাগল।

গাড়িতেই সে দাদিকে ধরে বসল, দাদি আমি যে প্রাইজ পেলাম তুমি আমাকে কী দিবা?

দাদি বললেন, আমি আবার কী দেব রে? আমি কি চাকরি করি?

না তোমার অনেক টাকা আমি দেখেছি...

ঠিক আছে তোকে আমি একটা লাল রঙের সোয়েটার বুনে দেব।

আচ্ছা তাতেই হবে। তার আগে আমি উলের বল দিয়ে ফুটবল খেলব।

নিলুফার আর নুরজাহান বেগম হাসেন। এর আগে নুরজাহান বেগম

বাড়িতে একটা সোয়েটার বানাচ্ছিলেন ক্রসকাটা দিয়ে, সেই উলের বলটা দিয়ে লেখা ফুটবল খেলতে চাইত। তাকে সেটা করতে দেওয়া হয়নি। এখন সোয়েটারের চেয়ে উলের বল দিয়ে খেলার দিকেই লেখার বেশি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

এরপর লেখা ধরল নুরিকে। দেখো নুরি আপি কী পেয়েছি... ফার্স্ট প্রাইজ...

অ বুঝছি হরলিস খাইছেন ফার্স্ট হইছেন...

আরে না বুদ্ধু রচনা লিখে ফার্স্ট...

সেখান থেকে দৌড়ে ফুপুর ঘরের দিকে ছুটল লেখা। ফুপি ফুপি....

ফুপি যথারীতি পড়ছেন। তার সামনে কতগুলো মানুষের হাড়-হাড্ডি। করোটি, বাহুর হাড়।

ফুপি বলো আমাকে কী দিবা? লেখার আল্লাদি গলা।

কেন রে তোকে আবার কী দেবো?

দেখো আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি ... এসে কম্পিটিশনে...

তাই নাকি... ফার্স্ট হয়ে গেলি....আগে বলতি আমিও যেতাম প্রাইজ গিভিং সেরেমোনিতে....

কী দিবা বললা না তো...

কী চাস? সাইকেল....

সাইকেল তো বাবা দিবে, তুমি আমাদের গেমস প্লাস রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবা...খাওয়াও যাবে খেলাও যাবে...

আচ্ছা নিয়ে যাবো যা।

এরপর ফোন করতে হবে বাবাকে। আর চাচুকে। আগে বাবাকেই করা উচিত।

আব্বু আমি এসে কম্পিটিশনে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি....

তাই নাকি বেটা...সাব্বাস...

এবার কিন্তু আব্বু আমাকে সাইকেল কিনে দিতেই হবে।

দিব।

আজকে আসার সময় নিয়ে আসবে।

আজকে না, শুক্রবার কিনে দেব...

শুক্রবার দোকান বন্ধ থাকবে

না নিউমার্কেট থেকে কিনে দেব...ঠিক আছে?

আচ্ছা...

রাতের বেলা লেখা আর ঘুমাতে পারে না। বিছানায় শুয়ে সে ছটফট করে। আঁকা পড়ছে। লেখা শুয়ে আছে।

দুজনেই শোবার পোশাক পরা। রাত ৯টা বাজে।

আঁকা বলে, কিরে খালি নড়াচড়া করতেছিস কেন। ঘুমা?

ঘুম আসছে না। আপা। আমার প্রাইজটা দাও তো।

আঁকা উঠে প্রাইজটা বিছানায় দিয়ে এল।

রাতের বেলা প্রাইজ নিয়ে কী করবি। আঁকা বলল।

পাশে রেখে ঘুমাই। স্বপ্ন দেখব।

আঁকা পড়ে। লেখা প্রাইজটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

আঁকা বলল, কী উত্তেজনায় ঘুম আসছে না।

না।

আমি অন্য ঘরে গিয়ে পড়ব? লাইট অফ করে দিব?

না তুমি বরং এই ঘরে পড়ো। আমিই আম্মুর ঘরে যাই।

আঁকা বলল, যা। আজকে তো সবাই তোর ওপরে খুশি।

লেখা বালিশ নিয়ে রওনা দিল।

নিলুফার তার ঘরে বসে মাথার চুল আচড়াচ্ছিল।

লেখা উঁকি দিল—আম্মু।

নিলুফার হেসে বলল, আয় আয়।

আজকে তোমার সাথে ঘুমাব।

আয়। ঘুমা।

তুমি ঘুম পাড়িয়ে দাও।

শো। আমি আসছি।

লেখা বিছানায় চলে যায়।

নিলুফার চিরুনিতে আটকে থাকা চুল বিনে ফেলে দিয়ে তারপর বিছানায় এল। বলল, মা ঘুমা ঘুমা। কাল সকালে স্কুল আছে। সকালে তো আবার তুই উঠতে চাস না।

আব্বু কখন আসবে।

তোর আব্বুর আসতে দেরি হবে। অফিসে কী একটা কাজ আছে

বলল।

তা হলে গল্প বলো।

তুই তোর গল্প বল। আচ্ছা বল তো রচনাটা কী লিখেছিলি...

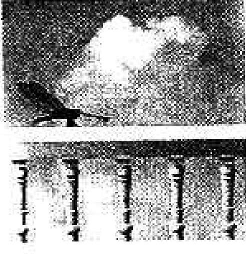
আমার মা লিখেছিলাম— আমার মায়ের দুটো শিং আছে...

কি আমি গরু?

আর আমি বাছুর হি হি হি!

নিলুফার লেখার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় দিতে দিতে ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি গান গাইতে শুরু করলে লেখা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

নিলুফার উঠে মশারি গুঁজে দিয়ে ইস্তিরির টেবিল পাতল। লেখার স্কুল ড্রেস ইস্তিরি করতে হবে।



রাতের বেলা। মোরশেদ বাইরে রাজাউজির মেরে এসে খেতে বসল। নুরজাহান বেগম তার পাতে ভাত তুলে দিচ্ছেন। মোরশেদ বলল, একা ভাত খাবো নাকি। সবাইকে ডাকো।

নুরজাহান বেগম বললেন, মুনির এখনও আসেনি। বউমা খাবে না। বাচ্চারা খেয়ে নিয়েছে।

মিতু খাইছে?

হুঁ। বাচ্চাদের সাথে খেয়ে গেছে।

তুমি খাইছ?

না।

খাও।

মুনিরের জন্যে একটু ওয়েট করি।

সে তো ভাবি করতেছেই। তোমার আবার ওয়েট করার কী হলো। নাও আমার সাথে খাও। নাকি আমি বেকার বলে আমার সাথে খাওয়া যাবে না।

কী বলিস না বলিস!

নাও হাত ধোও। বলে মুনির একটা বাটির মধ্যে মার হাত ধুয়ে দিল।

নুরজাহান বেগম ছোটছেলের আল্লাদের কাছে হার মেনে প্লেটে ভাত তুলে নিলেন। তিনি ভাত খেতে খেতে চেয়ে রইলেন ছেলের মুখের দিকে। সেই দিনের ছোট্ট মোরশেদ কত তাড়াতাড়ি কত বড় হয়ে গেল। কীভাবে বেড়ে ওঠে ছেলেরা। আর কত তাড়াতাড়ি অচেনা হয়ে ওঠে। তাদের জগত আলাদা, স্বপ্ন আলাদা, লক্ষ্য আলাদা। সেই জগতের কোনো চাবি মায়ের হাতে থাকে না।

মুনির আসছে না।

বার বার জানালা দিয়ে নিলুফার বাইরে তাকাচ্ছে। কত রাত করবে

মুনির। অফিস অফিস করেই সবটা সময় পার করে দেয় সে। আর ভারি মাকে ভালোবাসে। বাসুক।

তবে আর কোনো সমস্যা নাই। সেও ভালো। আজকালকার পুরুষ মানুষদের কত ধরনের বাইরের টান থাকে। ভাবতেই গা শিউরে উঠল নিলুফারের। বাইরের গাড়ির শব্দ। হেড লাইটের আলো। নিলুফার নিচে তাকাল। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে, এটা তাদেরই ছোট্ট গাড়িটা।

নিলুফার সাবধানে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

মুনির এল। সারাদিনের পরিশ্রমে ধ্বস্তপ্রায়।

তার হাতে একটা আস্ত বেবি সাইকেল।

নিলুফার হেসে বলল, এত রাতে এটা কিনলে কোত্থেকে।

মুনির বলল, লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিলাম। মেয়েটা একটা সাইকেল চেয়েছে, তাও যদি কিনে না দিতে পারি?

ড্রাইভার আবার কতগুলো বিরিয়ানির প্যাকেট নিয়ে হাজির।

স্যার...

মুনির বলল, যাও ভেতরে ডাইনিং টেবিলে রাখো।

নিলুফার বলল, এসব কী?

মুনির জানাল, ভুলুর বিরিয়ানি। অনেকদিন খাই না।

নিলুফার বলল, সবাই খেয়েছে। এত রাতে আবার এসব কে খাবে?

মুনির বলল, আরে আমরা খাবো। ডাকো সবাইকে।

ডাইনিং টেবিলে ড্রাইভার বিরিয়ানির প্যাকেট রেখে চলে যাচ্ছিল । নিলুফার ড্রাইভারকে দুটো প্যাকেট দিয়ে বলল, বাসায় নিয়ে যাও। তোমার বাচ্চাটা খাবে।

মুনির ঘরে ঢুকল। লেখাটা বিভোর হয়ে ঘুমাচ্ছে। তাকে দেখাচ্ছে একটা বিড়াল ছানার মতো। মুনির গিয়ে লেখাকে ডেকে তুলল। আম্মু আম্মু ওঠো। উঠে পড়ো।

লেখা ঘুমভরা চোখে তাকিয়ে বলল, কী?

দেখো, কী এনেছি?

কী?

অতি কষ্টে চোখ খুলে দেখল সাইকেল। সে হেসে আব্বুকে চুমু দিয়ে সাইকেলে বসল। এক পাক চালাল সাইকেলটা। তারপর চারচাকার সাইকেলে বসেই ঘুমুতে লাগল।

নিলুফার ডাইনিং টেবিলে বিরিয়ানি বাড়ছে।

মুনির সবাইকে ডাকার দায়িত্ব পালন করছে।

মার কাছে গিয়ে মা ওঠো মা ওঠো একটু ডাইনিঙে আসো, মিতুর দরজার কাছে গিয়ে এই মিতু ওঠ ওঠ, নুরি নুরি...আঁকা আঁকা...মোরশেদ মোরশেদ...মুনির সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

নুরজাহান বললেন, কী ব্যাপার, এত রাতে? কী হয়েছে?

মিতু বলল, ঘটনা কী? বাসায় ডাকাত পড়ল নাকি?

মুনির হেসে বলল, আমাদের লেখার প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষে এখন বিশেষ নৈশভোজ হবে। বিরিয়ানি প্রস্তুত। সবাই চোখ ধুয়ে এসে খেতে বসো।

নুরজাহান বেগম বললেন, পারিসও তুই। আমরা সবাই খেয়েছি না?

মুনির বলল, খেয়েছ। আবার খাবা।

মিতু বলল, ভালোই করছো ভাইজান, বহুদিন ভুলুর বিরিয়ানি খাই না। বোরহানি আনো নি।

মুনির বলল, না। এটা তো বড় ভুল হয়ে গেল। আচ্ছা আজকে বিরিয়ানি খা। কালকে তোদের বোরহানি খাওয়াব।

মোরশেদ চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে বলল, ঘটনা কী?

এদিকে লেখা সাইকেলে বসে ঘুমুচ্ছে। নুরিও আরেকদিকে মেঝেতে বসে ঘুমুচ্ছে।

সবাইকে ডাইনিং টেবিলে বসাল মুনির। নিজেও বসল। খেতে আরম্ভ করবে এই সময় বিদ্যুৎ গেল চলে। যা শালা। এই ভালোই হয়েছে। মোমবাতি জ্বালো। আমরা ক্যান্ডল লাইট ডিনার করব।

মোমবাতি জ্বালানো হলো। টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো একটা গেলাসে। চারদিকে বসে আছে নুরজাহান বেগম, মুনির, নিলুফার, মিতু, মোরশেদ, আঁকা। প্রধান অতিথি লেখা বসে আছে তার সাইকেলে।

সবাই বিরিয়ানি খাচ্ছে।

মোমবাতির আলো নড়ছে। সবারই ছায়া নড়ছে চারদিকের দেয়ালে।

শুধু মিনহাজুর রহমান তার বিছানায় ঘুমাচ্ছেন।

আর খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করছে নুরি।

মুনির বলল, নুরি তুইও নে।

নুরি বলল, দাদারে খাওয়াইয়া আমি তারপরে খামু।

এই মেয়েটাই বাবাকে দেখেশুনে রেখেছে। মুনিরের ভারি মায়া বোধ হলো বাবার জন্যে। নুরির জন্যেও।

নুরজাহান বেগম বিভিন্ন বাসায় ফোন করছেন। হ্যালো, স্লামালেকুম, শুনেছেন আমার নাতনির কীর্তি... হ্যাঁ ওতো রচনা লেখা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হইছে। হ্যাঁ একেবারে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত অনেকগুলো বাচ্চার মধ্যে। হ্যাঁ কালকে পুরস্কার পেল। না আগে থেকে জানায় নি। আরে হঠাৎ স্টেজে ঘোষণা...আচ্ছা রাখি।

হ্যালো কে সোনিয়া। তোর মা কইরে? জরুরি কী আর খবর! আমাদের লেখা রচনা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে, সেটা জানানোর জন্যে... হ্যাঁ হ্যাঁ...

স্কুল ছুটি হবে একটু পরে। নিলুফার নিতে এসেছে লেখাকে। আজকে রাস্তায় যানজট ছিল না বললেই চলে। নিলুফার স্কুলে চলে এসেছে তাই তাড়াতাড়ি। স্কুলের গেটের ভেতরে মাঠের এককোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ছুটির ঘণ্টার জন্যে।

বাচ্চার মায়েরা সব নিজেদের মধ্যে নানান গল্প করছেন–আপা কালকের কাহানি ঘরঘর কি দেখেছেন?

না আপা, বাচ্চার অত্যাচারে টেলিভিশন দেখার উপায় আছে। সারাক্ষণ কার্টুন দেখে।

আপনারটা তবু কার্টুন দেখে, আমারটা তো বাংলা সিনেমার পোকা হয়ে গেছে... কী সব গান গায়... বেয়াইন সাহেব ...

দেখেন তন্বিকে নিতে আজকে ওর বাবা এসেছে। কলব দিয়ে ভদ্রলোক তো একেবারে চ্যাংড়া সেজে এসেছে।

আড়ংয়ে সেল দিয়েছে, গেছলেন নাকি আপা...

ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে।

অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে এক সময় লেখাও বেরিয়ে আসে। তার হাতে একটা ম্যাগাজিন।

আম্মু আম্মু আমাদের ম্যাগাজিন দিয়েছে। আমার লেখা ছাপা হয়েছে....

নিলুফার বলল, তাই নাকি? দেখি...নিলুফার ম্যাগাজিনটার পাতা ওল্টাল। তারপর বলল, চল, গাড়িতে পড়বো।

স্কুল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে এসে উঠে বসল তারা।

গাড়ি চলছে। গাড়ির পেছনের সিটে নিলুফার আর লেখা। নিলুফার ম্যাগাজিনটার প্রচ্ছদের দিকে তাকাল। অনেকগুলো স্কুলের বাচ্চার ছবি। সে নিজের মেয়েকে এর ভিড়ে খুঁজতে লাগল। লেখার অত্যাচারে কি কোনো কিছু ঠিকমতো দেখা যায়। সে ম্যাগাজিনটা মার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল। বলল, আম্মু আমি তোমাকে রচনাটা পড়ে শোনাই।

শোনা।

আমার মা।

আমার মায়ের নাম নিলুফার। আমি তাকে ডাকি আম্মু বলে। আমার আম্মু সত্যি সত্যি আমার বন্ধু। আম্মু আমাকে স্কুলে দিয়ে যায়। আম্মু আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে যায়। আমাকে গোসল করায়, খাওয়ায়। আমার আব্বু ভীষণ ব্যস্ত। তিনি সময় পান না। আমার আম্মু আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও আম্মুকে খুব ভালোবাসি। আমার আম্মু দাদিকে খুব ভালোবাসে। ফুপুকে ভালোবাসে। সবাই আম্মুকে ভালোবাসে। আমার আম্মু সারাক্ষণ কাজ করে। তবু আমার আম্মুকে দাদি মাঝেমধ্যে বকা দেয়। তখন আম্মু একা একা কাঁদে। আমার আম্মুকে কাঁদতে দেখলে আমারও খুব কান্না পায়।

আমি বড় হলে আমার আম্মুকে আর কাঁদতে দেব না।

সর্বনাশ। লেখা তুই এগুলো কি লিখেছিস? নিলুফার আঁতকে উঠল। তার গা কাঁপছে ভয়ে।

লেখা বিস্মিত। কেন, ভুল লিখেছি?

তোর দাদি কবে আমাকে বকল, আর কবে আমি কাঁদলাম?

বারে সেদিনই তো কাঁদলে...

আরে সে তো চোখের অসুখ বলে চশমা নিতে হবে... তুই কিচ্ছু বুঝিস না... এসব কেন লিখতে গেলি বাবা... এখন কী হবে?

কী হবে মানে?

তোর দাদি যদি দেখে তাহলে এবার সত্যি সত্যি আমাকে বকা দিবে।

তোকেও দিবে।

তা হলে উপায়?

আয় এক কাজ করি। ম্যাগাজিনটা লুকিয়ে রাখি। দাদি বা ফুপুর চোখে কিছুতেই এটা পড়তে দেওয়া যাবে না।

আচ্ছা।

তোর কাছে থাকলে তুই না দেখিয়ে পারবি না। আমার কাছে থাকুক।

আমার যে খালি দেখতে ইচ্ছা করে।

তোকে রোজ স্কুলে যাওয়া-আসার সময় দেখতে দেব।

ঠিক আছে।

কিন্তু লেখার পেটে কথা একদমই থাকতে চায় না। দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার সময়েই সে বিপদ সৃষ্টি করতে গিয়েছিল।

ভাত মেখে নিলুফার খাওয়াচ্ছে লেখাকে। ওপাশে সোফায় বসে লাল উল বুনছেন নুরজাহান বেগম।

লেখা বলল, আম্মু আমাদের কাছে কী আছে, কাউকে বলা যাবে না, তাই না?

নিলুফার বলল, ভাত খা তো। ভাত খাবার সময় এত কথা বলার দরকার কী?

লেখা বলল, আর খাব না।

না, অল্প একটু খেয়েছ। আরেকটু খেতে হবে।

তাহলে আগে বলো তুমি আমাকে ম্যাগাজিনটা দেখতে দেবে।

দাদি বললেন, এই কী নিয়ে কথা হচ্ছে রে...

লেখা বলল, কিছু না দাদি আমার জন্মদিনের এলবাম...

নিলুফারের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর সারল, কী যে এলবাম দেখার অভ্যাস হয়েছে মেয়েটার....

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে রাত নামবেই। এটা তো আজকের কথা নয়। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এটা হয়ে আসছে। নিলুফারের কী সাধ্য সে ছাইচাপা দিয়ে আগুনের ধোঁয়ার উদ্গীরণ রুখবে।

ফোন এল। লেখার দাদিকে চায়।

নুরজাহান বেগম ধরলেন। হ্যালো...

খালাম্মা কেমন আছেন?

জি ভালো। কে?

আমি লেখার ফ্রেন্ডের মা...আমাকে তো খালাম্মা চিনবেন না... খালাম্মা... আপনার মতো একজন শাশুড়ি যদি আমাদের থাকত... আপনার নাতনি যে স্কুল ম্যাগাজিনে আপনার নামে এসব লিখল...আপনি নাকি কিছুই মনে করেন নি শুনে তো আমরা থ...

স্কুল ম্যাগাজিন... আমার নামে ... কী বলছ মা তুমি?

ওমা আপনি জানেন না...লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে লিখেছে... আমার দাদি আম্মুকে খুব বকা ঝকা করে.... আমার আম্মু তাই কান্নাকাটি করে। তখন আমার খুব মন খারাপ হয়...

কী বলছ মা তুমি। কই আমি তো জানি না...স্কুল ম্যাগাজিন বেরিয়েছে নাকি?

আল্লা আপনাকে দেখায় নি...কবে বেরিয়েছে...আমরা তো পড়ে অবাক...শাশুড়ির সম্পর্কে কেউ এভাবে বলে...আর শাশুড়ি তাকে কিছু বলে না...আপনি খালাম্মা মাটির মানুষ...এত ভালো শাশুড়ি আজকাল হয়ই না...

তুমি মা ম্যাগাজিনটার একটা কপি আমাকে দিতে পারো?

ঠিক আছে...

নুরজাহান বেগমের মাথায় আগুন জ্বলছে। এই মেয়েটা এই রকম একটা পিশাচ। আমার বিরুদ্ধে মেয়েকে দিয়ে স্কুলের ম্যাগাজিনে লিখিয়ে নিয়েছে। মাথা ঠাণ্ডা, মাথা ঠাণ্ডা নুরজাহান বেগম। তিনি ফোন রেখে নিলুফারের ঘরে গেলেন। নিলুফার একটা সিনে ম্যাগাজিন পড়ছে। নুরজাহান বেগম বললেন, বউমা আচ্ছা লেখার রচনাটা না ম্যাগাজিনে বেরুনোর কথা ছিল বেরিয়েছে...

নিলুফারের মুখ ভয়ে শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল। জানি না তো মা, বোধ হয় বের হয় নি... কেন মা!

না এমনি...

লেখা ঘরের মধ্যে সাইকেল চালাচ্ছে। দাদি তার কাছে গেলেন।

লেখা শোন তোর রচনাটা যে স্কুলের ম্যাগাজিনে বেরুনোর কথা ছিল, বেরিয়েছে?

লেখা সাইকেল ব্রেক করে হ্যান্ডেল বাঁকা করে দাঁড়িয়ে রইল। নীরব হয়ে।

কী বেরিয়েছে?

লেখা সাইকেল চালাতে লাগল।

কী, কথা বলিস না কেন?

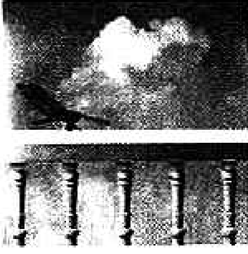
লেখা দাদির হাতের উলের বলটা নিয়ে ফুটবল খেলতে আরম্ভ করে দিল।

নুরজাহান বেগম ছুটে এলেন, এই এই করিস কি করিস কি!

লেখা বলল, কেন আমি তো বলেইছিলাম তুমি আমাকে উলের বল খেলতে দেবে।

তখন কী একটা হৈচৈ...হুটোপুটিই না লেগে গেল!

নিলুফার ঘরের মধ্যে একা। আলমারী খুলল। ম্যাগাজিনটা বের করল। তারপর একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে ম্যাগাজিনটা ফেলল পুড়িয়ে। কাজটা সহজ হলো না। অনেক বড় ম্যাগাজিন। সাদা সাদা মোটা মোটা পাতা। সহজে কি আর পোড়ে?



মিতু জেনে গেল ঘটনাটা। এবার সে আবির্ভূত হলো রঙ্গমঞ্চে।

লেখা এদিকে আয়। চকলেট নিবি?

লেখা বলল, কী চকলেট?

মিতু চকলেটের আবার কী কেন আছে নাকি? আয়....

লেখা কাছে গেলে মিতু চকলেট বের করে দিল।

মিতু বলল, এই লেখা তোদের ম্যাগাজিনটা কই রেখেছিস রে? আমাদের দেখতে দিলি না।

লেখা বলল, আমি না। আম্মু রেখেছে...

মিতু ক্লু পেয়ে গেল। সে তার ভাবির সন্ধানে চলল রান্নাঘরের দিকে। ভাবি ভাবি...

নিলুফার কড়াইয়ে তেল গরম দিয়েছে। মিতু বলল, ভাবি লেখা বলছে স্কুলের ম্যাগাজিনটা তোমার কাছে। দাও তো দেখি?

কড়াইয়ে পানিসহ সব্জি ছেড়ে দেয়ায় ছ্যাঁৎ করে শব্দ হলো।

নিলুফার বলল, কী জানি আমার তো মনে নাই কিছু। ও দিয়েছিল না কি আমার কাছে... লেখা লেখা...

লেখা সাইকেল নিয়ে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াল।

নিলুফার বলল, লেখা, তুই তোদের ম্যাগাজিন দিয়েছিলি আমাকে? কবে?

লেখা বলল, না দেই নাই....

সে আবার ঘরময় সাইকেল নিয়ে চক্কর দিতে আরম্ভ করল।

মিতু তো ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে ফোন করল স্কুলে লেখার ক্লাস টিচারকে।

হ্যালো, শাহনাজ মিস বলছেন। স্লামালেকুম আমি... ক্লাস ওয়ানের সারা হাসান লেখার আন্টি।

স্লামালেকুম...আপনি ভালো আছেন?

হ্যাঁ! আচ্ছা লেখা যে রচনা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হলো সেটা ম্যাগাজিনে বেরুনোর কথা না?

বেরিয়েছে তো আপনারা পান নি?

না।

লেখা নিয়ে গেছে তো...

ঠিক আছে। রাখি তাহলে...

মিতু বাসায় ঢুকছে। হাতে ম্যাগাজিনটা। কলবেল টিপল। নুরি দরজা খুলল। ঢুকেই মিতুর চিৎকার—মা, মা...এই নুরি মা কোথায় রে?

নুরি বলল, আছে ঘরে।

মিতু তার মা-বাবার ঘরে গেল। নুরজাহান বেগমকে সামনে পেয়ে বলল, মা জিনিস নিয়ে এসেছি... আসো ... দেখো ...রাগে আমার গা চড়চড় করছে....

নুরজাহান বেগম বললেন, কী হয়েছে বলবি তো।

মিতু বলল, দেখো। এই যে ম্যাগাজিন নিয়ে এসেছি। কট রেড হ্যান্ডেড!

মিতু ম্যাগাজিনটা খুলে দেখাল নুরজাহান বেগমকে। দ্যাখো কী লিখেছে, তুমি নাকি ভাবিকে বকাঝকা করো। আর ভাবি কান্নাকাটি করে। পড়ো...

নুরজাহান বেগম চশমাটা এনে নাকের ডগায় লাগাতে লাগাতে বললেন, কি? এসব কী? আর মানসম্মান বলতে কিছু থাকল না। বউমা বউমা এদিকে এসো... বউমা বউমা...

নিলুফার অন্যঘরে কাপড় ইস্ত্রি করছিল। ইস্ত্রিটা একটা কাপড়ের ওপরে রেখে দৌড়ে এল এই ঘরে। জি মা!

এসব কী? কী লিখেছে লেখা এসব!

নিলুফার মিনমিনে গলায় বলল, কী লিখেছে...

নুরজাহান তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, পাকা অভিনেত্রী ! কিছছু বোঝো না।

মিতুও আগুনে হাওয়া দিতে লাগল—ভিজে বেড়াল। কই মাছ ভাজার এক পাশটা খেয়ে অন্য পাশটা রেখে দেবে। উল্টে খেতে জানে না।

নুরাজাহান বললেন, আমি তোমাকে কবে বকাঝকা করলাম আর তুমি

কবে কান্নাকটি করলে যে সেটা লিখে ছাপিয়ে ঘরে ঘরে দিয়ে এসেছ। আর জিগ্যেস করলে বলে ম্যাগাজিন তো দেখি নাই। স্কুলের গার্জিয়ানরা আমাকে ফোন করে বলে আপনি বলে সহ্য করছেন আমরা হলে তো সহ্য করতাম না...

মিতু বলল, আবার কেমন মিথ্যা কথা, না ম্যাগাজিন দেখি নাই....

নিলুফার বলল, মা তিথি তোমরা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো...এটা তো আমি লিখি নাই ও ছোট মানুষ কী লিখতে কী লিখেছে আর কী ছাপা হয়েছে এটা নিয়ে এত হৈচৈ করাটা কি ঠিক?

নুরজাহান ধাতব গলায় বললেন, তাহলে তুমি বলো, কেন তুমি ম্যাগাজিনটা লুকিয়ে রেখেছ?

নিলুফার বলল, কারণ আমি আপনাদেরকে অযথা হার্ট করতে চাই নি।

নুরজাহান বললেন, সে কারণে তুমি একের পর এক মিথ্যা বলেছ আর মেয়েকে শিখিয়েছ মিথ্যা বলতে...

মিতু বলল, আর লেখাকে এসব লেখার কথা কে শিখাইছে? পারলা তুমি নিজের দাদির বিরুদ্ধে একটা বাচ্চা মেয়েকে এসব কথা শেখাতে...

নিলুফার বলল, আমি শেখাই নি।

মিতু বলল, তুমি না শেখালে ও এমনি এমনি লিখল এসব কথা...

নিলুফার বলল, কসম আমি ওকে এগুলো শেখাই নি। ও যা লিখছে নিজে লিখেছে...

নুরজাহান বললেন, নিশ্চয় তুমি ওর সামনে এসব আলাপ করো, না হলে ও শিখবে কী করে?

নিলুফার বলল, কক্ষনো না। কোনোদিনও না।

লেখা সব শুনল। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে গুটিশুটি মেরে। পাশে নুরি। লেখা কাঁদকাঁদ।

লেখা বলল নুরিকে, নুরি আপু আমার খুব খারাপ লাগছে... আম্মুকে ওরা মনে হয় আজ মেরেই ফেলবে...

নিলুফার কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে চলে গেল। ইস্ত্রির টেবিলে একটা কাপড়ের ওপর ইস্ত্রি রাখা আছে। ধোঁয়া উঠছে। নিলুফার দৌড়ে ইস্ত্রিটা সরিয়ে নিল। অনেকটা জায়গা পুড়ে গেছে।

বারান্দায় লেখা কাঁদছে। সে হেঁটে হেঁটে গেল তার দাদি আর ফুপুর

কাছে। বলল, দাদি বিশ্বাস করো। আম্মু আমাকে কিচ্ছু শিখিয়ে দেয় নি।

মিতু বলল, তোমাকে আর পাকামো করতে হবে না। তোমাকে আমাদের চেনা হয়ে গেছে। তুই তোর মায়ের মতো মিচকা শয়তান। মা তোকে যা শিখিয়ে দেবে, তুই তাই করবি। কী সুন্দর বলল, ম্যাগাজিন দেয় নাই। যা ভাগ।

আঁকা পড়ে ভিকারুননিসায়। তাদের স্কুলে একটা বিতর্ক উৎসব হচ্ছে। সে এই নিয়ে ব্যস্ত। বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকাল। বেল টিপলে দরজা খুলল নুরি।

আঁকা তার স্যান্ডেল জোড়া খুলে জুতার আলনায় রাখতে রাখতে বলল, কীরে। কী করিস? দরজা খুলতে কত ঘণ্টা লাগে?

নুরি বলল, আপা। ঘণ্টার হিসাব করনের উপায় নাই। বাসার অবস্থা বেশি ভালো না।

কী হলো আবার?

জানি না। দাদি হট হইয়া আছে।

কার সঙ্গে রাগারাগি করতেছে?

সবার সাথে।

আম্মু কোথায়? কী করে?

আপনের আম্মুর সাথেই রাগ?

ধেত্তেরিকা। এই বাসায় এই জন্যে আসতেই ইচ্ছা করে না।

আমারও এই বাড়িতে থাকতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কী করুম? গরিব মানুষ। আমারে তো আর গালি দিতেছে না। থাকি কষ্ট কইরা। আসেন। চুপচাপ আসেন।

আঁকা আস্তে আস্তে ঢুকল বাড়িতে। পরিস্থিতি কতটা খারাপ বোঝার জন্যে সে গেল তার চাচা মোরশেদের কাছে।

চাচা। কী হইছে বলো তো।

মোরশেদ তখন মন দিয়ে কম্পিউটারে ক্রিকেটের সিডি দেখছে। সে স্ক্রিন থেকে চোখ না তুলে বলল, কিছু হয় নাই। কী আর হবে? আমার শ্রদ্ধেয় জননী প্রতিদিনই বকবক করার কোনো না কোনো কারণ বের করে ফেলে। আজকেও করছে।

আঁকা বলল, চাচা এই বাসায় থাকতে আমার একদম ইচ্ছা করে না।

এত অশান্তি!

মোরশেদ বলল, আরে অশান্তি কি! সবকিছুকে ফান হিসাবে নে। নিজেকে একটা ডিস্টান্ট পজিশনে বসা। ভাব আমরা হলাম দর্শক। আর মঞ্চে নাটক হচ্ছে। তোর দাদি একটা ক্যারাক্টার। একটু ভিলেন টাইপ। কিন্তু কী আর করা! নাটকে তো সব ধরনের ক্যারেক্টারই লাগবে।

আঁকা কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, চাচা। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করে!

কী বলিস! এই পাগলি। আয় বস। তোকে একটা গল্প বলি...

গল্প বলা লাগবে না। আঁকার চোখে জল।

নিলুফার গেল মিনহাজুর রহমান সাহেবের কাছে। তিনি বাইরের ঘরে হুইল চেয়ারে বসে আছেন একা একা। টেলিভিশন খোলা। আপন মনে বকে যাচ্ছে ডিসকভারি চ্যানেল। নিলুফার একটা প্লেটে মাখানো ভাত আর চামচ নিয়ে শ্বশুরের কাছে গেল।

মিনহাজুর রহমান বললেন, কে বউমা?

নিলুফার বলল, জি বাবা।

ভাত এনেছো?

জি বাবা।

আমার খিদে পেয়েছে। তাই শব্দ শুনেই বুঝলাম বউমা ভাত নিয়ে এসেছে।

নিলুফার তার শ্বশুরকে চামচে করে ভাত তুলে খাওয়াচ্ছে। মিনহাজুর রহমানও ধীরে ধীরে চিবুচ্ছেন।

এই সময় নুরজাহান এলেন—এই তোমাকে কে বলেছে ওকে খাওয়াতে। যাও তুমি। বেশি বেশি। না?

নিলুফার বলল, রোজ তো আমিই খাওয়াই।

নুরজাহান ঝামটা মেরে বললেন, আজ থেকে আর খাওয়াতে হবে না। তিনি এগিয়ে গিয়ে নিলুফারের হাত থেকে প্লেট নিয়ে নিল।

নিলুফার আহত হয়ে চলে গেল ওই ঘর থেকে।

মিনহাজুর রহমান বললেন, কী হয়েছে?

নুরজাহান বেগম বললেন, কী আবার হবে! আলগা দরদ দেখাতে আসছে। এইসব আলগা দরদ দেখানো কাজ আমার একদম সহ্য না।

রোজ তো ওইই খাওয়ায়।

খাওয়ায় তো দুনিয়া উদ্ধার করে। কথা কম বলো। খাওয়ানোটা কী এমন কাজ? মনের ভেতরে বদমায়েসি। আর ওপরে ওপরে ভক্তি।

কেন কী হয়েছে?

মেয়েকে কী শিখাইছে উল্টাপাল্টা। মেয়ে স্কুলের রচনায় লিখছে: দাদি আম্মুকে বকা দেয়। আম্মু কাঁদে। লিখে সেটা ছাপায়া দিছে।

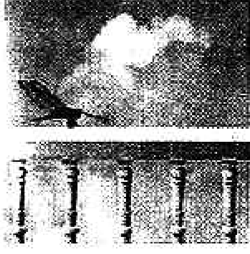
কথা তো সত্যই লিখেছে, নাকি?

সত্য। সত্য কথা! যদি লিখে আসত আমার দাদা একটা পাগল, সেটাও তো সত্য কথা হতো নাকি?

আমি পাগল! আমি পাগল! এটা তুমি বলতে পারলা।

ও! এইটা খুব লাগল। আর আমার নামে সারা দেশের মানুষ জানল আমি খারাপ। বউকে অত্যাচার করি। সেইটা তোমার লাগে না। যাও তোমাকে খাওয়াবই না।

নুর জাহান বেগম খাবারের থালা নিয়ে চলে গেলেন রেগেমেগে।



রাত। নিলুফার একা বসে আছে নিজের ঘরে। তার মন খুব খারাপ। বাইরে আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালা খোলা। বৃষ্টির ছাঁট ঢুকে মেঝে ভিজে যাচ্ছে। নিলুফারের এইসব দিকে খেয়াল নাই। তার ভেতরটা শূন্য শূন্য বলে মনে হচ্ছে।

এই সময় লেখা এসে পা টিপে টিপে ঢুকল ঘরে।

মার কাছে এসে বলল, আম্মু, মন খারাপ করো না। আব্বু আসুক। আব্বু নিশ্চয় দাদিকে ফুপুকে বকা দেবে। আমি আব্বুকে বলব, তোমার কোনো দোষ নাই। আমিই ভুল করেছি...

নিলুফারের চোখের জল গড়িয়ে পড়তে চাইছে। সে কোনোরকমে কান্না আটকে রেখে বলল, আমি মন খারাপ করি নি। তোকে এত চিন্তা করতে হবে না। তুই ঘুমা।

নিলুফার বুকে টেনে নিল লেখাকে।

বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। মুনির এসে নামল গাড়ি থেকে। বেশ রাত হয়েছে আজও। মুনির ঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বেল টিপল। নুরি দরজা খুলল। আর কেউ তার কাছে আসছে না। সে ঘরে গেল। নিলুফার চুপচাপ শুয়ে আছে। কথা বলছে না।

মুনির কাপড়চোপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, কী ব্যাপার শুয়ে যে, শরীর খারাপ নাকি?

কোনো উত্তর নাই।

মুনির পরিস্থিতি আন্দাজ করল।

এ-ঘর ও-ঘর গেল।

কিছুক্ষণ পর আবার এই ঘরে এসে বলল, কী ব্যাপার বড় গোলযোগ হয়ে গেছে নাকি?

নিলুফার কোনো কথা না বলে উঠে ডাইনিংয়ে গিয়ে ভাত বাড়ল।

মুনির আঁচ করতে পারল, আজকের পরিস্থিতি বেশ খারাপ। দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। মুনির আবার তার মার ঘরে গেল। নুরজাহান বেগম শুয়ে আছেন।

মুনির বলল, মা খেয়েছ।

নুরজাহান বেগম কোনো কথা বলছেন না।

মুনির আবার জিগ্যেস করল, মা খেয়েছ?

নুরজাহান বেগম বললেন, আর খাওয়া, মুখ দেখানো বন্ধ হয়ে গেছে।

কী হয়েছে? তোমরা কেউ কথা বলছ না কেন?

কী আবার হবে? আমি তোর বউকে ধরে সকালবিকাল বকি মারি— এ সব লিখে প্রচার করে বেড়াচ্ছে।

মুনির অসহায়ের মতো হাত নেড়ে বলল, আমি তো কিছুই বুঝছি না।

এই সময় মিতু এসে ঢুকল এই ঘরে। তার হাতে ম্যাগাজিনটা। সে লেখার লেখাটা বের করে মেলে ধরল মুনিরের সামনে। পড়ো।

মুনির পড়ল। পড়ে গম্ভীর হয়ে গেল। ভালোই তো ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছে মেয়েটা।

মিতু বলল, নিশ্চয় ভাবি শিখিয়ে দিয়েছে। না হলে কোনো বাচ্চা মেয়ে এ-সব লিখতে পারে।

নুরজাহান বেগম কাঁদতে কাঁদতে বললেন, স্কুলের সব মায়েরা ফোন করে আমাকে ছি ছি করছে...মানুষ এক সাথে থাকলে একটু-আধটু উনিশ-বিশ হয়ই, তাই বলে দেশসুদ্ধ মানুষকে ঢোল পিটিয়ে জানাতে হবে...মনে হচ্ছে মরে যাই...

মিতু বলল, মা তুমি চুপ করো। ভাইজান এসেছে এখন উনি বিহিত করুক। আবার আমরা এতদিন ধরে বলি ম্যাগাজিন কই ম্যাগাজিন কই, মেয়েকে শিখিয়ে দিয়েছে মিথ্যা কথা বলতে, নিজে তো মিথ্যা বলেই চলেছে।

মুনির রাতের বেলা নিলুফারকে বলল, নিলুফার, ঘরের কথা পরকে জানানো কি ঠিক। সব ফ্যামিলিতেই ঝগড়াঝাটি হয় আবার মিলমিশও হয়, তাই বলে...

নিলুফার জানে, মা ও বোনের কাছ থেকে পরিস্থিতির মনগড়া ভাষ্য

শুনেই মুনির এসেছে। সে শান্তস্বরে বলল, আমাকে বলছ কেন? আমি লিখেছি?

লেখা অতটুকুন মেয়ে, ও কেন এসব লিখতে যাবে...

ও তুমিও এই দলে...নিলুফার কেঁদে ফেলল।

মুনির বলল, কী মুশকিল! লোকজন কী ভাববে, আমার মা সম্পর্কেই বা কী ভাববে, আমার সম্পর্কেই বা কী ভাববে, বউকে মহাযন্ত্রণার মধ্যে রেখেছি, না? ও এরকমটা ভাবতে পারল কী করে? নিশ্চয় তুমি ওর সামনে এরওর সাথে আলাপ আলোচনা করো...

ও! সারাদিন পরে তুমি এই বিচার করতে এসেছো। আমাকে কত কথা শুনিয়ে দিল। আমি কিছু বলি নি, এতে আমার কী দোষ, তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি, ভেবেছি তুমি এলে ঠিকই বুঝতে পারবে পরিস্থিতি, উল্টা তুমিও একথা বললে?

ফ্যাচ ফ্যাচ করে কেঁদো নাতো .... আমার ওপর দিয়ে সারাটা দিন কী ধকলটা যায়...এরপর বাসায় এসে কী একটু শান্তি পাবো, একটু ভাতটাত খাব, গল্পগুজব করব, এদিকে হপ, ওদিকে ওর কান্নাকাটি...দুশ শালা কাল থেকে বাসাতেই আসব না...

তোমার বাড়ি তুমি কেন আসবা না, আমি ছোটঘরের মেয়ে, আমিই কাল সকালবেলা চলে যাবো...

কই যাবা?

জানি না! সেটা তোমার ভাবার দরকার কী? দু চোখ যে দিকে যায় চলে যাবো...

লেখা কখন যেন নীরবে এসে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। সব শুনছে। সে বাবা-মার ঘরে ঢুকে পড়ল, বলল, আব্বু আমিই রচনাটা লিখেছি। আম্মু কিছু শিখিয়ে দেয় নি।

মুনির বলল, মা তুমি কেন এই ঘরে এখন এসেছ। যাও মা। নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

নিলুফারের মনটা একদম বিষিয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছে, এই বাড়িতে তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এই বাড়ি থেকে বেরুলে হয়তো কিছুটা মুক্ত আলো-বাতাসের সন্ধান সে পাবে। কিন্তু সে যাবেটা কোথায়?

তার যে এই দুনিয়ায় যাওয়ার মতো একটা জায়গাও নাই।

সে যে নিজেই নৌকা করে নদী পেরিয়ে সেই নৌকাটা পুড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

আর ফেরার কোনো পথ তার নাই। তবু তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথায় সে জানে না। শুধু জানে, এই বাড়ির বাইরে কোথাও।

নিলুফার সুটকেস গোছাচ্ছে। মুনির এক কোণে দাঁড়িয়ে নিলুফারের সুটকেস গোছানোটা দেখছে। লেখা এল এই ঘরে।

নিলফুার বলল, লেখা তুই আমার সাথে যাবি, নাকি তোর আব্বুর সাথে থাকবি?

লেখা বলল, তোমার সাথে যাবো।

তাহলে তোর কাপড়চোপড় গুছিয়ে নে।

লেখা নিজের ঘরের দিকে গেল ব্যাগ গোছাতে।

মুনির বলল, নিলু, পাগলামো করো না।

পাগলামি করছি না।

মা বুড়ো মানুষ কী বলেছেন, না বলেছেন, এই নিয়ে রাগ করাটা তোমার একদম উচিত হচ্ছে না।

আমি অবশ্যই মার কথায় রাগ করি নি। আমি রাগ করেছি তোমার কথায়। তুমি কেন আমাকে ভুল বুঝবে... তোমার কাছে এই সমস্যার একটা সমাধান পাবো। দুজনে মিলে এ সমস্যার সমাধান বের করব, এই আশা নিয়ে আমি সারাদিন কাটিয়েছি। আর তুমি এসে উল্টো আমাকেই দোষ দিলে...

না, মানে আমি তোমাকে দোষ দিয়েছি না কি...এখন ধরো এটা আমাদের ফ্যামিলি প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তুমিই বা মুখ দেখাবে কী করে, আমিই বা মুখ দেখাব কী করে, আসলে স্কুলের উচিত ছিল এ লাইনটা কেটে দিয়ে রচনাটা ছাপানো...শোনো এখন কাপড়চোপড় ছাড়ো, বিকালবেলা তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো...

না তোমাকে আর এত কষ্ট করতে হবে না।

কই যাবা।

জানি না। আমার তো যাওয়ারও জায়গা নাই। দেখি। রাস্তায় বের হলে রাস্তাই একদিকে নিয়ে যাবে।

লেখা তার স্কুলের ব্যাগ ভরে কাপড়চোপড় নিয়ে হাজির। পেছনে পেছনে এল আঁকা।

আঁকা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। সে বলল, আম্মু কই যাচ্ছ।

নিলুফার বলল, জানি না।

আঁকা বলল, ভালো। যাও। আমিও একদিকে রওনা হয়ে যাব।

নিলুফার বলল, তুমি যাবা কেন? তোমার কী সমস্যা?

আঁকা বলল, এই বাড়ি আমার একদম ভালো লাগে না। আমি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।

নিলফার বলল, না। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে যাওয়ার বয়স তোমার এখনও হয় নাই। তুমি বাসায় থাকবা। দাদাকে দেখবা। এই লেখা চল।

নিলুফার ব্যাগ নিয়ে, লেখাকে নিয়ে সত্যি সত্যি বেরিয়ে যাচ্ছে।

মিনহাজুর রহমান বসে আছেন বাইরের বারান্দায়।

তার সামনে দিয়ে লেখা আর নিলুফার যাচ্ছে।

কে যায়? তিনি হাঁক ছাড়লেন।

আমি নিলুফার। আপনার বউমা।

সাথে কে?

লেখা।

কই যাও।

জানি না বাবা। আপনি বাবা আমাদেরকে একটু দোয়া করে দেন।

কী ব্যাপার? তোমার গলা কান্না কান্না কেন? ঝগড়াঝাটি হয়েছে নাকি!

না ঝগড়াঝাটি কি!

লেখা বলল, জি দাদাভাই। হয়েছে। দাদি আম্মুকে বকা দিয়েছে।

মিনহাজুর রহমান বললেন, তাই তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ বউমা। তুমি না থাকলে তোমার এই বুড়ো ছেলেকে কে দেখবে? কে খাওয়াবে। বউমা তুমি যেও না।

নিলুফার বলল, ঠিক আছে বাবা। আমার তো যাবার কোনো জায়গা নাই। লেখার বড়ফুপুর বাসা থেকে ঘুরে আসি।

মিনহাজুর রহমান বললেন, আচ্ছা যাও। তাড়াতাড়ি ফিরো।

সকালবেলার আলো ঝকঝক করছে। কালকে রাতেও কী বৃষ্টিটাই না হলো! এখনও পথে-ঘাটে পানি জমে আছে। লেখাকে নিয়ে নিলুফার একটা স্কুটারে উঠে বসল।

নুরজাহান বেগমকে কাজে হাত দিতে হয়েছে। বউমা নাই। কাজ তো এখন তাকেই করতে হবে। আর করবেটা কে? মিতু তো পরীক্ষার পড়া নিয়েই বাঁচে না। তিনি কাজ করছেন আর বকবক করছেন—বউমা কই গেল মুনির খোঁজ নিছে নাকি? ইদানীং তো আবার বাপের বাড়ির লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করছে। বাপের বাড়ি গেল নাকি? বাপের বাড়ি যদি যায়, তাইলে ওই বউকে আর বাড়িতে উঠতে দেওয়া উচিত হবে?

মিনহাজুর রহমান একা একা বসে আছেন বারান্দায়। দুপুরবেলা। তার খিদা লেগেছে। তিনি ডাকতে লাগলেন, বউমা বউমা। আমাকে যে দুপুরের ভাত দিলা না। বউ মা বউমা। বউমা...

নুরি এল খানিকক্ষণ পর।

কে ওটা? বউমা?

আমি নুরি।

এই তোরা আমাকে খেতে দিলি না? বউমা কই?

চাচিতো বাসায় নাই।

কই গেছে?

রাগ কইরা চইলা গেছে। কই গেছে কেউ কইতে পারে না।

ও! আমাকে কী যেন বলে গেল। আমাকে বলে গেছে। কই যেন গেল।

আপনারে কইয়া গেছে। আরে চাচি আর মানুষ পাইল না?

কেন আমাকে বলবে না তো কাকে বলবে। যা তোর দাদিকে বল ভাত দিতে।

আচ্ছা।

নুরি ভেতরে গেল। নুরজাহান বেগমকে গিয়ে বলল, দাদি! দাদায় ভাত খাইতে চায়। খিদা লাগছে।

নুরজাহান বেগম ধমকে উঠলেন, আরে আমার হাতে কাজ আছে না। এখন আমি এই দিকটা সামলাব নাকি তোর দাদাকে খাওয়াব। যা বল দেরি হবে।

এই নুরজাহান বেগমের সুরই বিকালবেলা হেলানো সূর্যের মতো খানিকটা হেলে পড়ল।

তিনি ডাইনিংয়ে একা বসে আছেন। নুরি চা দিচ্ছে।

তিনি বললেন, একা বাসাটা এত খারাপ লাগছে। লেখা না থাকলে... ভালো লাগে না।

নুরি বলল, চাচি কামটা খুব খারাপ করছে। বাইরে যাইতে মন চাইছে যাউক। কই গেছে কইয়া যাইব না। কইছে। কারে? দাদারে। দাদা কিছু মনে রাখতে পারে? দাদা একটা কওনের মানুষ হইল।

নুর জাহান বেগম বললেন, আরে বউমার বেয়াদবিটা দেখ। বাচ্চা মেয়ে কী লিখছে না লিখছে সেইটা নিয়া তুমি কেন রাগ করো। তোমাকে বলছি নাকি?

নুরি বলল, সেই তো। আপনার তো মেজাজ সব সময়ই গরম থাকে। একটু বকাবকি করতেই তো পারেন। হেইটা মাথায় নিয়া কেউ বাইরায়া যায়?

নুরজাহান বেগমের খারাপ লাগতে শুরু করে। লেখাকে নিয়ে বউটা গেল কোথায়? তার বাবার ওখানে আবার উঠল না তো? উঠলেও ভালো, না উঠলেও ভালো। উঠলেও খারাপ, না উঠলেও খারাপ।

উঠলে তবু নিশ্চিন্ত, কোথাও আছে। আর না উঠলে একটা দুশ্চিন্তা—গেল কোথায়। উঠলে একটা দুশ্চিন্তা, আবার ওই ফ্যামিলিতেই? সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? না উঠলে নিশ্চিন্ত, যাক, ওই ফ্যামিলিতে তো ওঠে নাই। এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে নুরজাহান বেগম ফোন করলেন মুনিরকে। বিকালবেলা। মুনির তখন তার অফিসে।

হ্যালো, মুনির। খোঁজ নিলি বউমা কোথায় গেছে।

মুনির বলল, না। পেলাম না তো।

নিজের বউয়ের খোঁজ নিতে পারিস না। কী নিয়া অত ব্যস্ত।

অফিসের কাজ আছে।

তাই বলে বউয়ের খোঁজ নিবি না?

আমি নিব কেন? আমি তো গণ্ডগোল করি নাই। যারা যারা গণ্ডগোল করছো তারা তারা দেখো।

এটা কী ধরনের কথা বললি। আমি গণ্ডগোল করছি।

না করো নাই। সবদোষ আমার কপালের। আমি পারব না। উফ অফিসের কাজ নিয়া পারি না। আর... রাখো তো...বিরক্ত মুনির ফোন রেখে দিল খটাস করে।

সন্ধ্যা। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। অসময়ের বৃষ্টি মনে হয় ঠাণ্ডা ডেকে আনল দাওয়াত করে। নুরজাহান বেগম তার উলের সোয়েটার বোনার কাজের গতি বাড়িয়ে দিলেন। হঠাৎই মনে হলো, যার জন্যে সোয়েটার বানাচ্ছেন, সেই তো নাই। তিনি উল বোনা থামিয়ে গেলেন ফোনের কাছে। ফোন করলেন মোরশেদের মোবাইলে। মোরশেদ তখন নেটে ব্যাটিং প্রাকটিস শেষ করে কেবল এসে বসেছে মাঠের পাশে।

রিং বাজল। মোরশেদ ধরল। হ্যালো।

মোরশেদ। বাসা থেকে মা।

মা আমি এখন খেলা নিয়া ব্যস্ত।

খেলা কোনো ব্যস্ত হবার বিষয় হলো।

এই মায়েদের জন্য দেশটা আগাইতেছে না। ডেভ হোয়াটমোর কি আমাদেরকে ক্রিকেট বেটে খাওয়াইয়া দিবে। বাংলার মায়েরা ক্রিকেট খেলাটাকে কোনো সাবজেক্ট হিসাবেই যদি না নিতে পারে।

আমি যা বলি শোন। তোর ভাবি যে লেখাকে নিয়ে চলে গেল কোথায়, গেল কী সমাচার, দেখতে হবে না?

দেখতে হবে। দ্যাখো। আমাকে বলতেছো কেন?

তোকে বলব না তো কাকে বলব? আয়। খোঁজ কর কোথায় গেছে?

আচ্ছা আমি আসতেছি। এখন রাখো তো মা।

মার সঙ্গে কথা বলে ফোনটা রেখে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মোরশেদের মনে হলো, তাই তো। কাজটা তো ঠিক হচ্ছে না। ভাবি কোথায় একটা খবর তো নেওয়া উচিত। রাত হয়ে আসছে।

মোরশেদ তাড়াতাড়ি ফোন দিল মিতুর মোবাইলে।

মিতু। কী করিস?

বল্ কী?

ভাবি কোথায় যাইতে পারে তোর ধারণা আছে?

আমি জানি না। ক্যান?

আরে মা এখন চিল্লাচিল্লি করতেছে। বলে বউমা কোথায় গেছে খুঁজে দ্যাখ। মাথা গরম করার সময় গরম করে ফেলে। তখন হুঁশ থাকে না। এখন মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। এখন মনে পড়তেছে বউমা কই।

সেই। মা তো বউমা কই বউমা কই করতেছে। আর বউমা কোথায় যাচ্ছে না যাচ্ছে কোনো কিছু না বলে চলে গেল। সে এই বাড়ির

লোকগুলোর কথা একবারও ভাবল না। আর তার জন্যে চিন্তা-চিন্তায় আমি মরে যাচ্ছি।

আরে ভাবি ভাবতেছে, না ভাবতেছে না, আমরা জানি নাকি? আমাদের কাজ তো আমাদের করতে হবে। কোথায় যাইতে পারে তোর কোনো কিছু মনে হলে বল।

তার বাবা-মার বাড়ি গিয়া খোঁজ নিতে পারিস। ইদানীং তো আবার বাপের বাড়ির সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করে দিছে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। মানে ভাবির সাহস দিন দিন বাড়তেছে।

নিজের বাপের বাড়ির সাথে যোগাযোগ রাখতে কি সাহস বাড়া লাগে নাকি।

লাগে না?

ধর তোরও একদিন বিয়ে হবে। না? তখন তুই যদি আমার সাথে যোগাযোগ রাখিস সেটার জন্যে সাহস লাগবে?

অবশ্যই। আমি যত অন্য ধর্মের লোকের সাথে যাই আর আমার ধর্ম চেঞ্জ করি তখন তো আর তোদের সাথে আমি রিলেশন রাখতে পারি না, না!

আমাদের যদি আপত্তি না থাকে।

আমার নিজেরই তো সম্মান বোধ থাকা উচিত তাই না। এই ধরনের কেস ঘটাইলে আমি কখনও এই বাড়ির দিকে আসব না।

বলাটা খুব সোজা মনে হচ্ছে। বাস্তবে তোকে কতটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে সেটা ভাব। আর তারপরও সেই স্যাক্রিফাইসটা যদি তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা স্বীকার না করে মর্যাদা না দেয় তখন?

তুই সংসারের কিছুই বুঝিস না। তুই এইসব ব্যাপারে একদম কথা বলতে আসবি না। বলে দিলাম।

আরে আমি বলতে আসছি নাকি। তোরাই তো আমাকে বলতেছিস...

আমি বলি নাই। বলবও না।

তোর সাথে কথা বলে খালি মোবাইলের বিল তুললাম। রাখি।

মুনির আজকে তাড়াতাড়িই ফিরেছে। সে গেল আঁকা-লেখার ঘরে। দেখল আঁকা মন দিয়ে কী যেন একটা লিখছে।

মুনির বলল, তোর আম্মুর কোনো খোঁজ পেলি।

আঁকা মাথা না তুলে বলল, নাহ।

যন্ত্রণা হলো তো! আবার লেখাটাকে নিয়ে গেছে। তোকে কোনো কিছু বলে যায় নাই।

না।

ফোন করেছিল।

না।

এইসব হুজ্জতির কোনো মানে হয়?

আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছ কেন?

না। জিজ্ঞেস করছি না। জাস্ট বলতেছি। কোনো মানে হয় না।

আসলেই হয় না।

তুই কী করিস?

আরে ডিবেটের স্ক্রিপ্ট লিখি। কালকে এইটা আমাদের বারোয়ারিতে করতে হবে।

বারোয়ারি কী জিনিস?

সেইটা তুমি বুঝবা না।

নুরজাহান বেগম নামাজ পড়ছেন। এশার নামাজ। মুনির বাইরের ঘরে বসে টিভিতে খবর দেখছে। সবগুলো বেসরকারি চ্যানেলে একযোগে খবর হচ্ছে। খবরের মধ্যে প্রায়ই বিজ্ঞাপন বিরতি। সেইসব বিরতিরও আছে নাম। এখন দেখুন অমুক কোম্পানি বিজ্ঞাপন বিরতি। তার মধ্যে আবার অন্য কোম্পানির বিজ্ঞাপন। আশ্চর্য তো।

বাসায় ফোন বেজে উঠল। ডাইনিং স্পেসে ফোনটার একটা লাইন আছে।

মিতু ধরল।

ফোন করেছেন মিতুর বড় বোন। তার নাম মোনা।

মোনা বলল, কে? মিতু।

বড়পা?

হুঁ।

বলো।

আঁকার মাকে দে তো!

ভাবি তো নাই।

কই গেছে।

কী জানি কই গেছে।

কী জানি কই গেছে মানে কী? কখন গেছে?

সকালে গেছে। লেখাকে সাথে নিয়া গেছে। কই গেছে কিছু বলে যায় নাই।

বলে যায় নাই মানে। কই গেছে তোরা খোঁজ করবি না। বাচ্চা মেয়েটাকে সাথে নিয়া গেছে।

আমরা কোথায় খোঁজ করব। মনে হয় মার বাড়ি গেছে।

গাধাগুলান পাইছ এক কথা। মনে হয় মার বাড়ি গেছে। তোদের সবগুলিকে একদম...নে কথা বল...

হ্যালো

লেখা তুই কই?

বড় ফুপির বাসায়।

বড়পার বাসায় গেছিস। তো বড়পা বলবে না ফোন করে? আমরা চিন্তায় চিন্তায় মারা যাচ্ছি।

পাশে দাঁড়ানো মোনা লেখাকে বলল, কী বলে তোমার ফুপি?

লেখা ফোন থেকে মুখ সরিয়ে বলল, আমরা চিন্তা চিন্তায় মারা যাচ্ছি।

মোনা ফোন নিয়ে বলল, কে কে চিন্তায় চিন্তায় মারা গেল।

মিতু বলল, সবাই টেনশন করতেছে না?

মোনা বলল, করুক। মরলে খবর দিস। ওরা আসছে। থাকুক এই বাসায় কয়েকদিন।

মিতু ফোন রেখে তার মার কাছে গেল। মা পাওয়া গেছে।

নুরজাহান বেগম বললেন, কই?

বড়পার বাসায় গেছে।

দেখছ কী চালাক...মুনিরকে বল। বেচারা খুব চিন্তায় আছে।

আচ্ছা বলতেছি।

মিতু বলার আগেই মোনা ফোন করল মুনিরের মোবাইলে। মুনির। আঁকাকে নিয়ে আমাদের বাসায় চলে আয়। রাতে এক সাথে খা।

বড়পা মানে একটা অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা? বউ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

জি ... মানে...

লেখা আর নিলুফার এইখানে আছে। তুইও আয়। আঁকা সাথে নিয়ে আয়। আর মিতুকে আর মোরশেদকে বলে দ্যাখ ওরাও আসতে পারবে নাকি।

ও। নিলুফার তোমার ওখানে। আশ্চর্য আমার তো আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল...

গাধা যে তোরা। এই জন্যে তোদের মনে হয় নাই।

মুনির গিয়ে নিয়ে এসেছে লেখা আর নিলুফারকে। মোনা এসেছিল এই বাসায়। এসে বেশ বকাবকি করে গেছে মাকে। বাসায় মোটামুটি যুদ্ধবিরতি চলছে। এর মধ্যে একটা সুখবর নিয়ে এল মোরশেদ। নুরজাহান বেগম ও মিনহাজুর রহমান বসেছিলেন তাদের ঘরে।

মোরশেদ ঢুকল। তাকে বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে।

মোরশেদ বলল, মা। একটা সুখবর আছে।

নুরজাহান বেগম বললেন, কী?

আমি ফার্স্ট ডিভিশনে খেলব। আজকে কন্ট্রাক্টে সাইন করে আসলাম।

কী করবি?

বড় ক্লাবে খেলব। এখন থেকে খেলে টাকা পাব।

এইটা কোনো সুখবর হলো। আমি ভাবলাম ফাস্ট ডিভিশনে ডিগ্রি পাস করেছিস। এত করে বলি ডিগ্রিটা কম্প্লিট কর। অশিক্ষিত হয়েই থাকবি।

মা খেলোয়াড়রা কী পাস না পাস, এটা কেউ দেখতে আসে না। সে রান পাচ্ছে নাকি পাচ্ছে না, সেইটা হলো ব্যাপার।

কী জানি বাবা,

মিনহাজুর রহমান বললেন, এই কী হইছে? আমাকে তো বললি না।

মোরশেদ বলল, বাবা আমি ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবে চান্স পাইছি। এখন থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলব।

কোন খেলা?

ক্রিকেট বাবা।

ক্রিকেট। তোর ক্রিকেট ব্যাট আছে? লাগলে বলিস। আমি কিনে দেব। তোর মা এগুলো বুঝবে না। যা লাগবে আমাকে বলবি।

বাবা তুমি আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করে দাও।

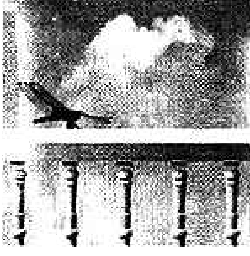
আয়।

মোরশেদ কাছে যায়।

মিনহাজুর রহমান তার মাথায় হাত রাখেন।

মোরশেদ বলল, বলো অনেক বড় খেলোয়াড় হ। ন্যাশনাল টিমে চান্স পা।

মিনহাজুর রহমান বললেন, অনেক বড় খেলোয়াড় হ। ন্যাশনাল টিমে চান্স পা।



মোরশেদ ফার্স্ট ডিভিশন টিমে চান্স পাওয়া উপলক্ষে মিতু, লেখা ও আঁকাকে নিয়ে গিয়ে পিজা হাট থেকে পিজা খাইয়ে নিয়ে এসেছে।

এদিকে বাসায় ঘটে গেছে আরেক কাণ্ড।

পাক্ষিক পরিবার থেকে একজন পিয়ন এসেছে বাসায়। সে বেল টিপলে নুরি দরজা খুলে দিল। পিয়ন বলল, এইখানে নিলুফার বেগম থাকেন।

নুরি বলল, জে, থাকে।

পিয়ন এক কপি পত্রিকা দিয়ে বলল, ওনার পত্রিকা।

ওনার পত্রিকা মানে কী?

এইটাতে ওনার লেখা আছে।

নুরির পেছন পেছন নুরজাহান বেগমও এসে হাজির। কে এসেছে রে?

নুরি বলল, এই বইটা দিয়া গেল?

কী বই?

আপনের না। চাচির।

কী জিনিস চাচির। দে তো দেখি।

এটা দিয়া গেল। এটাতো নাকি খালাম্মার লেখা আছে।

বউমার লেখা? বউ মা আবার কী লিখল।

নুরজাহান বেগম পাতা ওল্টালেন। অনেক খোঁজাখুজি করে পেলেন নিলুফার বেগমের একটা লেখা। লেখার নাম সোনার সংসার।

নুরজাহান বেগম বললেন, যা তো আমার চশমাটা আন। তিনি আবার তার সুনামহানির জন্যে একটা চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন।

নুরি চশমা এনে দিলে তিনি পাঠ করলেন...

সোনার সংসার

নিলুফার বেগম

আমার সংসারকে আমি বলি সোনার সংসার। আমি, আমার স্বামী, ননদ, দেবর আর দুই মেয়েকে নিয়ে আমার সংসার। আমার শাশুড়ি খুব ভালো। যেমন মিষ্টি ব্যবহার, তেমনি...

পড়া শেষ হলে প্রসন্নতায় তার মনটা ভরে উঠল। তিনি বললেন, এই যে বউমা ঠিক কথাগুলো লিখেছে। আর লেখাটা তো একটা বোকা। কী লিখেছিল না লিখেছিল। মিতু মিতু, দেখে যা বউমা কত সুন্দর একটা লেখা লিখেছে...

রাতের বেলা মুনিরকে লেখাটা দেখালেন নুরজাহান বেগমই। লেখাটা পড়ে আর মার মুখে হাসি দেখে মুনিরের মনটা ভালো হয়ে গেল।

নিলুফারকে তাই বলছিল মুনির–তোমার এত বুদ্ধি। তুমি আবার সাপ্তাহিক কাগজে লেখা ছাপালে...

আমি মেয়ে মানুষ না। মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকে। লেখার লেখাটা ছাপা হবার সাথে সাথে আমি দৌড়ে গেলাম সাপ্তাহিকটির অফিসে... ভাই আমার লেখাটা তাড়াড়ি ছাপেন।

লেখাটা কিন্তু তুমি ভালোই লিখেছ।

হেডিংটা কেমন হয়েছে বলো তো!

কী যেন হেডিংটা...

সোনার সংসার....

নুরজাহান বেগম বিভিন্ন জায়গায় ফোন করতে লাগলেন। এই কে? সেজ আপা। পাক্ষিক পরিবার পত্রিকাটা দেখেছ! আরে কারেন্ট সংখ্যা। যাও এখনই কিনে আনো। আমার বউমার একটা লেখা বের হয়েছে। কিনে এনে পড়ো। পড়ে তারপর আমাকে ফোন কোরো। হ্যাঁ। আরে আমার বউমার তো অনেক গুণ।

এটা রেখে আরেকটা ফোন–হ্যালো, আমি ধানমণ্ডির খালাম্মা, ন্যান্সি তোর মা কই। আচ্ছা শোন, একটা পাক্ষিক পরিবার কিনে আন তো এই সংখ্যা। আন না। নিলুফার বেগমের একটা লেখা আছে। সোনার সংসার।

লেখাটা পড়বি। তোর মাকেও পড়তে দিবি....নিলুফার বেগম কে? বল তো। আমার বউমা। মুনিরের বউ। বুঝছি।

আরেক জায়গায় ফোন করলেন। হ্যালো, আমি সেজ ফুপু...

মিনহাজুর রহমানকে নুরি নিলুফার বেগমের লেখাটা পড়ে শোনাল।

সোনার সংসার : নিলুফার বেগম

মিনহাজুর রহমান বললেন, নিলুফার বেগম কে?

চাচি। আঁকাপার আম্মু।

বউমা?

জে।

আচ্ছা পড়।

সোনার সংসার : নিলুফার বেগম

আমার সংসারকে আমি বলি সোনার সংসার। আমি, আমার স্বামী, ননদ, দেবর আর দুই মেয়েকে নিয়ে আমার সংসার। আমার শাশুড়ি খুব ভালো। যেমন মিষ্টি ব্যবহার, তেমনি...

দাড়া দাঁড়া। শাশুড়ি মানে কী?

শাশুড়ি মানে বুঝেন না। আপনের স্ত্রী।

আমার স্ত্রী? আমার স্ত্রীর মিষ্টি ব্যবহার। বউমা এই রকম একটা মিথ্যা কথা লিখতে পারল?

ও মা। না লেইখা কী মরব। এর আগে লেখা আপায় কী একটা লেইখা যা অসুবিধা করছিল কিনা কন!

তাই বলে মিথ্যা কথা। না না।

নুরজাহান বেগম এলেন। বললেন, এই কী নিয়ে এত পুটুর-পাটুর হচ্ছে?

তোমার ব্যবহারটা মিষ্টি। বউমা কথাটা ঠিক লেখে নাই। লিখতে হতো: অতি সুমধুর। আজকালকার মেয়ে তো ভাষা জানে না।

নুরজাহান বেগম বললেন, তুমিই ভাষা জানো না। ও যা লিখছে ঠিকই লিখছে। সব সত্য কথা তো লেখা যায় না। তাইলে তো লিখতে হয়, আমার শ্বশুর মশায় একটু...

কী?

নুরি বলল, স্ক্রু ঢিলা।

নুরজাহান বেগম বললেন, যা ভাগ। মানে একটু আত্মভোলা টাইপ আর কি!

নুরি উঠে চলে গেল।

মোরশেদ তার ঘরে বসে ইন্টারনেটে চ্যাট করছিল। তার একটা বন্ধু থাকে লন্ডনে। তার সঙ্গে। তার ঘরভরা দেশবিদেশের ক্রিকেটারদের ছবি। আর সিডি রাখার শেলফ ভরা নানা সিডি।

টুক টুক শব্দ। তার ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছে কে?

কাম ইন। মাথা না ঘুরিয়েই বলল মোরশেদ।

চাচা। দ্যাখো কাকে আনছি। আঁকার গলা।

কাকে? কি বোর্ডে টাইপ করতে করতে মোরশেদ বলল।

আমার ফ্রেন্ড। ওর নাম কারিশমা। কারিশমা খুব ক্রিকেটের ফ্যান। ও খালি তোমাকে দেখতে চায় তোমার সাথে কথা বলতে চায়।

আসো। বসো। কারিশমা কোন দলের ফ্যান? মোরশেদ মাথা ঘোরাল। সত্যিই আঁকা একটা বান্ধবীকে ধরে এনেছে।

ইন্ডিয়া। আপনি? কারিশমা বলল।

মোরশেদ বলল, বাংলাদেশ।

কারিশমা বলল, বাংলাদেশ তো আমরা সবাই।

মোরশেদ বলল, তাইলে বললা না কেন?

কারিশমা বলল, আপনাকে যদি বলি আপনি কোন কোন দেশ ভিজিট করছেন, আপনি কি বলবেন বাংলাদেশ ভিজিট করছি? বলবেন?

মোরশেদ বলল, যুক্তিটা ভালোই দিছ। কিন্তু বাংলাদেশ ওয়ানডে আর টেস্ট স্টাটাস পাওয়ার পর যদি কেউ বলে আমি পাকিস্তানের সাপোর্টার বা ইন্ডিয়ার সাপোর্টার। দুঃখজনক না?

কারিশমা বলল, বাদ দেন। আপনার কথা বলেন। আপনি কী বোলার না ব্যাটসম্যান।

মোরশেদ বলল, আমি? ব্যাটসম্যান। বলও করি। পার্ট টাইম আর কি!

লেখা বলল, আরে আমার চাচা অল রাউন্ডার।

মোরশেদ বলল, বসো। বসে কথা বলো।

ওরা বিছানায় বসলে মোরশেদ বলল, তুমি খেলা ফলো করো।

কারিশমা বলল, ইন্ডিয়ারটা করি। দেখেন না পাকিস্তানের সাথে

কীভাবে হারল। সৌরভ থাকলে কিন্তু এইভাবে হারত না। কী বলেন?

লেখা বলল, সৌরভ থাকলে কী করত? ও তো রান পায় না?

কারিশমা বলল, ক্যাপ্টেনসির ওপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। সৌরভ অনেক জিদ্দি ক্যাপ্টেন...তাই না..আংকেল..

মোরশেদ বলল, ক্যাপ্টেন হিসাবে তো ভালো... দেখা যাক...

কারিশমা বলল, আপনার খেলা কবে।

লেখা বলল, চাচা তো ফার্স্ট ডিভিশনে খেলবে। আমরা খেলা দেখতে যাবো। তুই যাবি।

কারিশমা বলল, যাবো যাবো কবে খেলা?

মোরশেদ বলল, ফিকশ্চার এখনও ফাইনাল হয় নাই।

কারিশমা বলল, হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন...

লেখা বলল, এই চল চল স্যারের কাছে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে না।

কারিশমা বলল, চল চল।

ওরা বেরিয়ে গেল। একটা স্নিগ্ধ ভালো লাগার অনুভূতিতে খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইল মোরশেদের অন্তরটা।

আঁকা আর কারিশমা বেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের টিচারের কাছে যেতে হবে। মিনহাজুর রহমান বসে আছেন বারান্দায়। তিনি হাঁক ছাড়লেন—কে যায়?

আঁকা বলল, আমি আঁকা।

অ। সাথে কে যায়?

কারিশমা।

কে?

কারিশমা।

বুঝি না।

কারিশমা। আমার ফ্রেন্ড। কারিশমা কাপুরের নাম শোনো নাই। সেই কারিশমা।

কারিশমা কাপুর কে?

আরে হিন্দি ছবির নায়িকা।

ও। আমাদের বাসায় আসছেন। হ্যালো, হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ইন ঢাকা?

কারিশমা বলল, আই? আই লিভ ইন হেয়ার!

মিনহাজুর রহমান বললেন, ও ইউ আর আ বাংলাদেশি?

আঁকা বলল, দাদা আমার ফ্রেন্ড বললাম না।

মিনহাজুর রহমান বললেন, তুই বললি না নায়িকা। হিন্দি ছবি করে।

আঁকা বলল, তার নামে নাম।

মিনহাজুর রহমান বললেন, ও। ভালো আছো বোন।

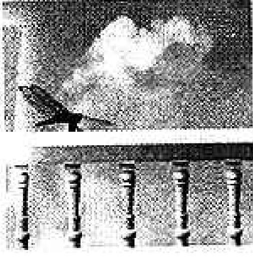
কারিশমা মাথা নেড়ে বলল, জি আছি।

আঁকা বলল, দাদা আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। টিচারের কাছে যেতে হবে। যাই।

ওরা চলে গেল।

সবাই চলে যায়।

বার্ধক্য হচ্ছে নিঃসঙ্গতার কাল। এই সময়টাতে একটুখানি সঙ্গের লোভে মনটা আকুল হয়ে থাকে। কিন্তু সেইটাই পাওয়া যায় না। মানুষ কেন যে বুড়ো হয়! বুড়ো হলেও যেন সে সুস্থ থাকে, কর্মক্ষম থাকে। তার করবার মতো যেন এক-আধটা কাজ থাকে।



অনেক রাত। মিতু তবু পড়ছে। পড়তে তাকে হবেই, মেডিকালের পড়া। তার সামনে নরকংকালের হাড়গোড়, আর করোটি।

নুরির ঘুম ভেঙে গেলে সে উঠে পানি খেল। দেখল একমাত্র ফুপুর ঘরে আলো জ্বলে। ফুপু মনে হয় পড়ে। যাই, তাকে এক কাপ চা বানায়া দেই। নুরি চা বানায়।

ততক্ষণে ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেল। মিতু মোমবাতি জ্বালাল।

এরই মধ্যে ফোন এল মোবাইলে। সে ফোনটা নিয়ে গেল বারান্দায়–হ্যালো সাথি কী করিস?

সাথী বলল, কিছু না। টিভি দেখতেছি।

নুরি মিতুর রুমে ঢুকল অন্ধকার ঠেলে।

রুমে কেউ নাই।

সে হঠাৎই দেখতে পেল নরকংকালের মাথাটা।

মোমবাতির আলোয় নরকংকালের মাথাটা জ্বল জ্বল করছে আর তার ছায়া নড়ছে।

নুরি বলল, ফুপু। ফুপু।

মিতু ফোনের জবাব দিচ্ছে, কী? বল?

নুরি বলল, আপনে কই? আপনেরে দেখি না কেন?

মিতু ফোনে সাথীকে বলছে, পড়ার চাপে আমি মরে ভত্তা হয়ে গেছি।

নুরি বলল, কী কন?

মিতু সাথীকে বলছে, আমার মৃত্যুর জন্যে মেডিকালের পড়া দায়ী। মরে ভূত হয়ে আমি এনাটমির লেকচারারকে গিয়ে ধরব দেখিস। গলা টিপে ধরব।

নুরি বলল, আমারে ধইরেন না।

মিতু বলল, তোকেও ধরব। আমার হাত দিব বাড়ায়া। লম্বা হয়ে তোর

গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

নুরি চিৎকার করে কাপ-পিরিচ ফেলে দিয়ে পালায়।

মিতুর হঠাৎ খেয়াল হলো, ঘরে কী যেন ঘটছে। সে ছুটে এল, কী হইছে?

নুরি ততক্ষণে পালিয়ে গেছে।

নিলুফারের কাছে একটা ফোন এল। নুরি ধরেছিল। তাকে বলল, আঁকা লেখার মাকে একটু দেন না।

নিলুফার ফোন ধরে বলল, হ্যালো।

হ্যালো। আঁকা লেখার মা আছে?

বলছি।

আপা।

কে?

আমি এলিসন।

ফোন করছিস কেন? নিলুফারের শরীর কাঁপতে থাকে।

এলিসন বলল, মা তোকে দেখতে চায়। একদিন আয় বাসায়।

না। আমি যাবো না। কখনও ফোন করবি না।

বাবা দেশে নাই। দুপুরবেলা বাসায় কেউ থাকে না। চলে আয়। মার সাথে দেখা কর।

বললাম তো না।

আপা। মার শরীরটা বেশি ভালো না। মনে হয় বেশিদিন বাঁচবে না। মরার আগে তোকে একবার দেখে মরতে চায়। তুই আয়।

না আমি যাবো না।

দ্যাখ। যা ভালো মনে করিস। মার শরীরটা খারাপ বলে বললাম।

নিলুফার ফোন রেখে দিল।

কিন্তু তার মনটা খারাপ হয়ে রইল। খুব খারাপ। মার অসুখ। মা তাকে দেখতে চায়। এদিকে সে এই সংসারে থাকতে হলে ওই বাসার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কথা ভাবাও যাবে না। সে এখন কী করবে?

রাতের বেলা নিলুফারের ভালো করে ঘুম হয় না। স্বপ্নে দেখতে পেল মা তাকে ডাকছেন।

মা লিজা লিজা। মা বললেন।

মা। আমাকে একবার শেষ দেখা দেখতে আসবি না মা।

মা আমি তো আর লিজা না মা। আমি নিলুফার।

নাম বদলালেই কি মা মেয়ের সম্পর্ক বদলে যায় রে মা। তুই তো আমার মেয়েই।

মা। তুমি কি আমাকে তোমার ঘরে ঢুকতে দিবা?

আমিই তো তোকে ডাকছি।

বাবা শুনলে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিবে।

আমার তো আর আয়ু বেশি দিন নাই। বাড়ি থেকে তো আমি এমনিই বের হয়ে যাবো রে। আমার পরপারের ডাক যে এসে গেছে। যীশু আমাকে ডাকছেন।

মা মাগো। আমি আসব।

নিলুফারের ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে বসল। পাশে মুনির শুয়ে আছে। নিলুফার বাথরুমে গেল। সেখানে গিয়ে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল।

মোরশেদ ঘুমিয়ে। রাত দুটো। তার মোবাইল বেজে উঠল। মেসেজ আসার বাজনা।

মোরশেদের ঘুম ভেঙে গেল। সে মোবাইল তুলে দেখল মেসেজ এসেছে।

সে মেসেজটা পড়ল। কারিশমা পাঠিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলা দেখছি। লারা নামল। আপনি কী করেন? কারিশমা।

এসএমএস পড়ে মোরশেদ আরেক কাত হলো। সকালে উঠে সে দৌড়াতে বার হবে।

ভোরবেলা মোরশেদ বাইরে জগিং করতে গেল। ধানমণ্ডি লেকের চারপাশে একটা পাক দিল দৌড়ে।

জগিং করে ফিরে এসে সে মোবাইলে কল দিল কারিশমাকে।

কারিশমা তখন ঘুম।

সে ঘুমের মধ্যেই ফোন ধরল। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে সে বলল, হ্যালো।

এই রাতের বেলা কী এসএমএস পাঠাইছ?

মোরশেদ আংকেল? কালকে খেলা দেখেন নাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের? লারা একশ আটাত্তর করছে।

না দেখি নাই।

লারার খেলা দেখেন নাই! বলেন কি!

সারা রাত খেলা দেখলে ভোরবেলা উঠে জগিং করতে বার হওয়া যাবে না। তাইলে চিরটাকাল খেলা দেখতেই হবে। খেলতে আর হবে না।

তবে কালকের খেলাটা একদম ক্লাসিক। এইটা দেখা উচিত ছিল।

তুমি কী করো?

আমি ঘুমাইতেছিলাম। আপনার ফোন পেয়ে জাগলাম। আজকে আপনাকে দিয়ে সকালটা শুরু হলো। দেখা যাক কেমন যায়।

তুমি এখনও ঘুমাইতেছ। বাইরের দুনিয়া কখন জেগে গেছে। সূর্য ওঠার আগে উঠবা। দেখবা সারাটা দিন কেমন ফ্রেশ যায়।

কারিশমা ফোন কানে দিয়ে ঘুম দিচ্ছে।

বুঝছ। আরলি টু বেড এন্ড আরলি টু রাইজ কথাটা এমনি এমনি হয় নাই। বুঝছ। হ্যালো হ্যালো... আরে মেয়ে মনে হয় ঘুমায়া পড়ছে...হ্যালো হ্যালো...

মোরশেদ ফোন কেটে দিল।

সকালবেলা মুনির রেডি হচ্ছে অফিস যাওয়ার জন্যে।

নিলুফার তার টাইটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, তোমার সারাদিন আজকে কী কাজ? অফিসেই থাকবা।

হ্যাঁ। কেন? মোরশেদ বলল।

তোমার সাথে আমার একটু কথা ছিল।

বলো।

পরে বলব।

পরে কেন। এখনই বলো।

না পরেই বলব। অফিসে ফোন করব...

লেখা রেডি হয়ে চলে আসে, স্কুলের ড্রেস পরে।

লেখা বলল, আম্মু। আমার চুল বেঁধে দাও।

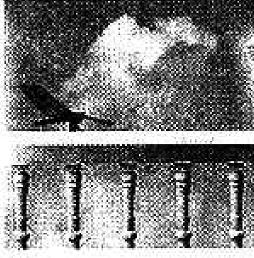
নিলুফার বলল, আয়। তোর চুলগুলো এবার কেটে ছোটো করে দিব।

না। চুল কাটবা না।

কেন। চুল কাটতে চাস না কেন? কষ্ট হয় না।

নাহ।

নিলুফার চুল আচড়ে দিয়ে বেনি করে দিল মেয়ের।



নুরির খুব জ্বর। ডাক্তার দেখানো দরকার। মিতুর প্যারাসিটামল চিকিৎসায় জ্বর ভালো হয় নি। সে তাই তাদের কলেজের একজন তরুণ শিক্ষককে ডেকে নিয়ে এসেছে নুরিকে দেখানোর জন্যে। তার নাম জাকির হোসেন। উনি দেখতে লম্বা, খুবই পাতলা এবং ধবধবা ফরসা। ছাত্রছাত্রীরা আড়ালে তাকে হোয়াইট ওয়াশ বলে। স্যারকে মোবাইলে ফোন করে আসতে বলার সঙ্গে সঙ্গে উনি রাজি হয়েছেন এবং বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে নিজে নিজে চলে এসেছেন। বাসার সামনে এসে তিনি মিতুকে মোবাইলে ফোন করলে মিতু বাইরে বেরিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়– স্যার আসেন। বসেন স্যার। বাসা চিনতে কোনো কষ্ট হয় নাই তো?

না। খুব সহজ লোকেশন তো। পেসেন্ট কে?

আমাদের বাসায় কাজ করে স্যার। নুরি।

ও! ডাক্তার হোয়াইট ওয়াশ একটু হতাশ হলেন মনে হলো।

আপনি স্যার বসেন। আমি দেখে আসি ভেতরের কী অবস্থা। তারপর স্যার আপনাকে নিয়ে যাবো।

আচ্ছা।

স্যার ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসেন। ওখানে মিনহাজুর রহমান বসে ছিলেন হুইল চেয়ারে।

মিনহাজুর রহমান বলেন, কে ওখানে বসে।

জি আমি। আমি ডাক্তার জাকির।

ডাক্তার। ডাক্তার কেন? কার অসুখ?

কাজের মেয়ের।

নুরির। নুরির কী হয়েছে?

আমি এখনও দেখি নাই। দেখে বলতে পারব।

ডাক্তার সাহেব। আমাকেও একটু দেখে যাবেন।

জি আচ্ছা।

ওরা আমাকে খেতে-টেতে দেয় না। আজ সারাদিন আমি কিছুই খাই নাই।

কিছুই খান নাই। কেন?

এ-বাড়ির কেউ আসলে আমাকে পছন্দ করে না।

আচ্ছা আমি ব্যাপারটা দেখব।

আমি বলেছি সেটা আবার বলো না। তুমি একটা কাজ করো। তুমি ডাক্তার হিসাবে আমাকে দেখো। দেখে বলো, সর্বনাশ এই ভদ্রলোককে তো আপনারা ঠিকমতো খাবার দেন না। আজ তিনদিন হলো ইনি কিছুই খান নাই। ঠিক আছে।

জি! ঠিক আছে।

মিতু এল। স্যার আসেন, ভেতরে আসেন।

জাকির ভিতরে গেল মিতুর সঙ্গে। নুরি সার্ভেন্টস রুমের বিছানায় শুয়ে আছে।

জাকির তার কাছে গেল। জিভ দেখে। চোখ দেখে। স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে বুক দেখে।

মিতু বলল, স্যার প্যানিক থেকে জ্বর হতে পারে? ও তো ভূতের ভয় পেয়েছিল।

জাকির বলল, সিম্পটম ধরে আগাই। জ্বর ভালো না হলে টেস্টগুলো করাও। চারদিকে ডেঙ্গু হচ্ছে। ঠিক আছে। ভালো হয়ে যাবে। নাম যেন কী?

নুরি স্যার। মিতু বলল।

জাকির বলল, নুরি তুমি চিন্তা কোরো না। ভালো হয়ে যাবে। তেমন কিছু হয় নাই। ওষুধ ঠিকমতো খাও। আপা যা দিয়েছেন সে-সবই চলুক।

নুরি বলল, ওষুধ তো খাইতেছি। পথ্য ঠিক মতো খাইতেছি না।

জাকির বলল, মানে।

নুরি বলল, দুইবেলা ভাত খাই। জ্বরের রুগীরে কেউ ভাত খাওয়ায়? রুটি, পাউরুটি, আপেল, কমলা, বেদানা, আংগুর এইসব খাইলে না ভালা হইতাম।

জাকির বলল, তাই তো। তোমাকে তো ভালো পথ্য দেওয়া হয় নাই। ঠিক আছে পথ্য ভালো দিতে হবে। আমি লিখে দিচ্ছি। মিতু, আই থিংক

ইউ ক্যান ট্রাই দিস টাইপ অফ ফুড অ্যান্ড ফ্রুটস। ইফ দিস ইজ আ রিয়েল সাইকোলজিকাল কেস, দিস টাইপ অফ ফুড মে হেল্প হার সাইকোলোজিকালি। দিয়ে দেখো।

মিতু বলল, ঠিক আছে স্যার।

রোগী দেখে ডাক্তার বাইরের ঘরে এল।

নুরজাহান বেগমও এলেন। মিনহাজুর রহমান তো ছিলেনই।

মিতু পরিচয় করিয়ে দিল মায়ের সঙ্গে শিক্ষকের।

নুরজাহান বেগম বললেন, কেমন দেখলেন নুরিকে।

জাকির বলল, মনে হয় সেরে যাবে। ও পথ্য খেতে চায়। রুটি ফলমুল খেতে দেন। সাইকোলোজিকালি ভালো হয়ে যেতে পারে।

নুরজাহান বলল, আশ্চর্য মেয়ে তো! ওকে কি আমরা খারাপ খাওয়াই।

জাকির বলল, না তা বলে নাই। আগেকার দিনে ধারণা ছিল তো জ্বর হলে ভাত খেতে নাই। তাই ভাবছে। কাজেই ওকে রুটি ফলমুল খাওয়ায়ে দেখতে পারেন। যদি ভয় পেয়ে জ্বর এসে থাকে তো এইসব খেয়েদেয়ে ভালো হতেও পারে।

মিনহাজুর রহমান বললেন, আমাকেও ডাক্তার একটু দেখে দেন।

জাকির বলল, আপনি তো মনে হচ্ছে তিনদিন কিছুই খান নাই।

মিনহাজুর রহমান কেঁদে ফেললেন, ওরা তিনদিন আমাকে একটা ভাত পর্যন্ত খেতে দেয় নাই।

নুরজাহান বেগম বললেন, এই মিথ্যা কথা বোলো না।

মিনহাজুর রহমান বললেন, আমি না হয় মিথ্যা বলতেছি, ডাক্তার কি মিথ্যা বলতেছে। বলো ডাক্তার আমি তিনদিন কিছু খাইছি?

নুরজাহান বেগম বললেন, খবরদার ডাক্তার ওর কথায় প্রশ্রয় দিবা না। একটু আগেই কতগুলান পেঁপে খেল।

মিনহাজুর রহমান বললেন, তুমি বেশি জানো। ডাক্তার দেখছে আমি তিনদিন কিছুই খাই না...

নুরজাহান বেগম বললেন, কেন শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলছ।

মিনহাজুর রহমান বললেন, তোমরা আমাকে খাবারও দিবা না। আবার মিথ্যা কথা স্বীকার করতে বলবা। তাতো হবে না। ডাক্তার শোনো। এই মহিলার মাথাটা খুব গরম। এই মহিলার মাথাটা ঠাণ্ডা করার ওষুধ দিও তো।

নুরজাহান বেগম বললেন, কী যাতা বলতেছ বাইরের লোকের সামনে। আর ডাক্তার তুমিও কেমন মানুষ বলো তো। এক পাগলের কথায় বলে ফেললা, আপনি তিনদিন ধরে কিছু খান না। এইটা বলা কি তোমার উচিত হইছে।

মিতু বলল, মা তুমি থামো তো।

নিলুফার ফোন করেছে মুনিরকে।

মুনির অফিসে। নিলুফার বাসা থেকে।

নিলুফার বলল, হ্যালো মুনির?

মুনির বলল, কে?

আমি বাসা থেকে।

ও নিলু! বলো।

শোনো। তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। এলিসন ফোন করেছিল।

এলিসন কে?

এলিসন। আমার ছোটবোন।

এতদিন পরে? কী চায়?

মার নাকি শরীরটা খুব খারাপ। মা নাকি আর বাঁচবে না। মরার আগে আমাকে দেখতে চায়।

তো?

কী করি বলো তো।

এটা তো আমার ব্যাপার না। তোমার ব্যাপার। তুমি যা ভালো মনে করো করো।

তুমি কী বলো?

না আমি কী বলব?

আমি যাবো মার সাথে দেখা করতে?

এটা তোমার ব্যাপার। তুমি কি করবা না করবা আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছ কেন?

তোমাকেই তো জিজ্ঞাসা করব। তোমাকে ছাড়া আর কাকে জিজ্ঞাসা করব। তুমি বললে যাবে, না বললে যাবো না।

দেখ তোমার যদি না যাবার ইচ্ছা থাকত, তাইলে তো তুমি আমাকে

জানাতাই না। আমাকে যখন জানাইছ নিশ্চয়ই তোমার যাওয়ার ইচ্ছা আছে ষোল আনা। এখন বাকিটা তোমার ওপর। আমি কিছুই বলব না। তুমি যেতেও পারো। নাও পারো।

আমি গেলে তুমি কি মাইন্ড করবা?

না মাইন্ড করব কেন?

ভেবে বলো। এখনই বলার দরকার নাই।

না ভাবাভাবির কী আছে, তাই না। এতদিন মা তোমাকে ত্যাজ্য করে রাখল। এখন তার মনে হয়েছে মেয়ের মুখ দেখি। এখানে আমার কী বলার আছে। যাও। দেখা করো।

নুরজাহান বেগম এই ঘরে এলেন। তাকে নিলুফার তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা রাখি তাহলে।

নুরজাহান বেগম বলল, কার সাথে কথা বলছ?

আপনার ছেলের সাথে।

দাও তো দেখি।

নিলুফার বলল, মুনির, এই ধরো মা কথা বলবেন।

নুরজাহান বেগম ফোন নিয়ে বললেন, হ্যালো মুনির?

জি মা।

দুপুরে খাইছিস?

হ্যাঁ মা খাইছি। তোমরা খাইছ?

খাইছি তো বাবা। তোর বাবা তো আজকে একটা কাণ্ড করল। মিতুর স্যার আসছে ডাক্তার। তাকে কেঁদে-কেটে বলল, আমরা না কি তাকে তিনদিন ধরে না খাওয়ায়া রাখছি। বল কী রকম লাগে?

ওনার তো মা ওইটাই অসুখ। কোনো কথা মনে থাকে না। এটা নিয়ে মন খারাপ কোরো না। আচ্ছা।

ঠিক আছে রাখি।

ফোন রেখে নিজের মনে নুরজাহান বেগম বললেন, বউমা কাকে ফোন করল হঠাৎ, তাই চেক করে দেখলাম। আবার কাকে ফোন করে না করে। ইদানীং তো বাপের বাড়ির সাথে কানেকশন হইছে ....

নুরি তার বিছানায় বসে বসে আঙুর-বেদানা খাচ্ছে। এখন সে অনেকটাই ভালো। লেখা গেছে তার কাছে।

নুরি আপু। কী করো।

পথ্য খাই।

পথ্য কী?

এই যে এইসব। আঙুর বেদানা। পাউরুটি।

এইসব খাইলে কী হয়?

জ্বর জারি ভালা হইয়া যায়।

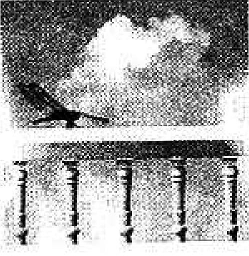
তোমাকে কে বলল?

ডাক্তার সাবে কইল।

জ্বর হয়ে তো তোমার ভালোই মজা হয়েছে মনে হচ্ছে।

হ। ভূতের আছর লাগছে তো। মজা তো হইবই।

নুরজাহান বেগম বললেন, লেখা নুরির কাছে ঘুরঘুর কোরো না। ভাইরাস হলে আবার তোমাকে ধরবে। আসো এদিকে। অগত্যা লেখাকে সরে যেতে হলো।



নিলুফার আবার ধরল মুনিরকে। রাতের বেলা। বলল, দেখো তুমি আমার হাজবান্ড। আজ ১৮টা বছর তুমি আমি এক সাথে আছি। আমার ক্রাইসিসের সময় আমি তোমার কাছে বুদ্ধি চাব না তো কার কাছে চাব।

মুনির বলল, আমার বুদ্ধি তুমি চাচ্ছ ঠিক আছে। কিন্তু কী করবা এটা তো তুমি জানোই। তুমি আসলে তোমার মার সাথে দেখা করতে যাবা। আমি যদি না বলি তোমার মন খারাপ হবে। আমি কেন বলব।

তুমি যদি না বলো আমার মন খারাপ হবে ঠিক আছে। মন খারাপ করেই থাকব। যাবো না।

কাজেই আমার কথা শোনার তোমার দরকার নাই। তুমি যাও।

তুমি যাও বললে পষ্ট করে যাও বলো। আর না বললে পষ্ট করে না বলো।

আরে সারাদিন আমি অফিসের কাজে বিজি থাকি। তোমার এইসব নিয়ে ভাবার আমার সময় আছে। তুমি তোমার নিজের বুদ্ধিতে চলো।

না, তা চলব কেন? আজ পর্যন্ত কোনো কাজই নিজের মতে করি নি। এটাও করব না।

তাইলে মার সাথে কথা বলো।

মার সাথে! তুমি জানো এটা সম্ভব না।

মাকে বলো। মা যদি রাজি হয় তাইলে... আমি এখন ঘুমাব। কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করবা না।

এরপর নিলুফার কী করতে পারে? সে ঠিক করল আঁকার সঙ্গে কথা বলবে। সে আঁকার ঘরে গেল। বলল, মা তুমি বড় হইছ। তোমার সাথে একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে কথা বলব। ঠিক আছে।

কী?

তোমার নানি সম্পর্কে তুমি কী জানো?

আমার নানা-নানি দুজনেই তোমার ছোটবেলায় মারা গেছে। তুমি অনেক কষ্টে মানুষ হইছ। আমাদের কোনো নানা-নানি নাই।

হুঁ। এই রকমই তোমাকে বলা হইছে। কিন্তু... কিন্তু আজকে আমি তোমাকে সত্য কথা বলব। আমি আসলে... আমি তোমার আব্বুকে পছন্দ করি। আমরা বিয়ের ডিসিশন নেই। তোমার নানা-নানি সেটা মেনে নিতে পারেন নাই। আমি তোমার আব্বুকে বিয়ে করে এই বাসায় চলে আসি। এরপর আর তাদের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না।

ফানি তো। তোমার আব্বু-আম্মু পরেও মেনে নেয় নাই।

না।

কেন? আব্বু মোটেও তোমার অযোগ্য না।

আছে ব্যাপার। দুনিয়াতে নানা রকমের ব্যাপার থাকে। সবটা তুমি বুঝবা না।

বলো। বুঝব। আমি বড় হইছি।

না বুঝবা না। যাই হোক তোমাকে কেন এইসব কথা বলতেছি। মার শরীরটা খুব খারাপ। তোমার নানির কথা বলতেছি। উনি সম্ভবত আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তোমার একজন খালা আছে। উনি ফোন করেছিলেন। মা আমাকে দেখতে চান। আমি বুঝছি না মার সাথে আমার দেখা করা উচিত কিনা। ডু ইউ আন্ডারস্টান্ড?

আব্বুকে বলো।

বলেছি। তোমার আব্বু দায়িত্ব নিতে চায় না। হ্যাঁও বলে না। নাও বলে না।

ওকে। ডেফিনিটলি তুমি তোমার আম্মুর সাথে দেখা করবে। ভদ্রমহিলা ইজ গন ডাই, তাই না?

বাট ইউ নো দিস ফ্যামিলি ওয়েল...

একটা কাজ করো। চাচার সাথে কনসাল্ট করো।

রাইট। এটা একটা ভালো বুদ্ধি হতে পারে।

নিলুফার মোরশেদের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। মোরশেদকে সব বলে বলল, সব তো শুনলা। বলো আমার কী করা উচিত?

মোরশেদ বলল, তোমার মার ওপরে তোমার রাগ যদি না থাকে

তোমার উচিত দেখা করা। আফটার অল শি ইজ ডায়িং। না?

বলছ তুমি?

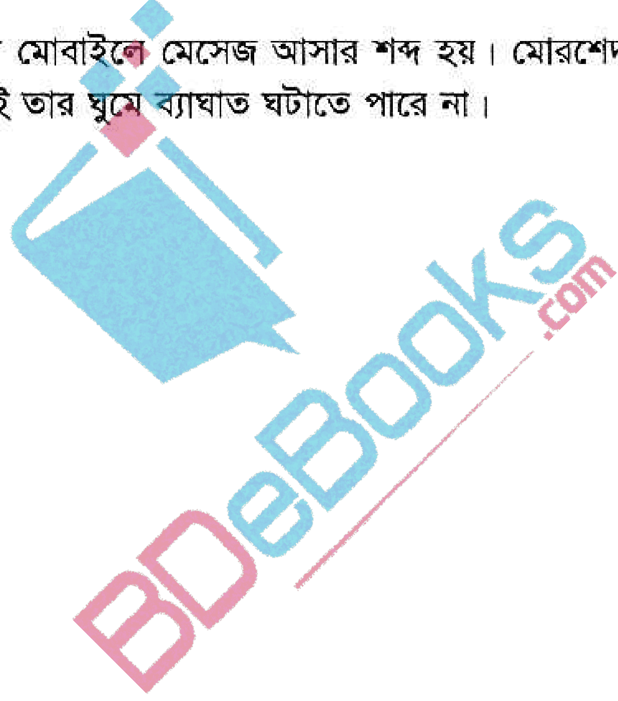
হ্যাঁ।

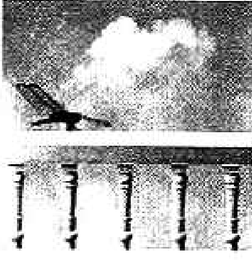
তুমি নিয়ে যাবা আমাকে।

যাবো। শোনো আঁকাকেও সাথে নাও। তোমার মা নিশ্চয়ই চাবে তার নাতনিকে দেখতে। ছোটটাকে নিও না। ও দুনিয়ার এইসব প্যাঁচঘোঁচ বুঝবে না। বড়টাকে সাথে নাও।

রাত। আঁকা আর লেখা শুয়ে আছে। আঁকার ঘুম আসছে না। তার মা তাকে কী সব বলল। কালকে যাবে মার সঙ্গে নানিকে দেখতে। তাদের বাসায় এত সমস্যা কেন?

অন্য ঘরে মোরশেদের মোবাইলে মেসেজ আসার শব্দ হয়। মোরশেদ ঘুমেই থাকে। কোনো শব্দই তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না।





পরের দিন আঁকা, নিলুফার আর মোরশেদ একটা ইয়েলো ক্যাব নিয়ে রওনা হলো নিলুফারের মার বাসার উদ্দেশে।

বারান্দা থেকে নুরজাহান বেগম দেখেন, তিনজনে মিলে কই যেন যায়।

ক্যাব এসে থামে একটা পুরোনো সুন্দর বাড়ির সামনে। বাগানওয়ালা বাড়ি। খিলানওয়ালা লম্বা বারান্দা। চারদিকে একটা আভিজাত্যের ছাপ।

তারা নামল।

মোরশেদ বলল, ভাবি, আমি এখানে ওয়েট করছি। তোমরা ঘুরে আসো। যতক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে থেকো। ক্যাবের জন্যে বা আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।

আঁকা আর নিলুফার এগুতে থাকে বাড়ির দিকে।

আঁকা বলল, মা এটা কি তোমাদের বাসা?

নিলুফার বলল, ছিল।

তুমি কি ছোটবেলায় এই বাসাতেই ছিলা?

হ্যাঁ।

কতদিন পর আসছ মা?

১৮ বছর তো হবেই।

একই শহরে থেকে এই বাসায় আসলা ১৮ বছর পর। মা তুমি পারলা?

মেয়েমানুষ। সব পারে মা।

আমি হলে পারতাম না। আমি জোর করে এসে নিজের মায়ের সামনে দাঁড়াতাম। বলতাম, মা, তুমি আমাকে যাই বলো না কেন আমি আসবই।

আমি তো তোকে আসতে মানা করব না রে।

তোমার মাও নিশ্চয়ই তোমাকে আসতে মানা করে নাই।

মা তো ব্যাপার না। বাবা।

তোমার বাবা? আমার নানা! আজকে উনি যদি বাধা দেন?

উনি বিদেশে আছেন।

তারা এগুতে থাকে। নারকেল গাছ, পুকুরপার, বনেদি এই রকম একটা ছায়া ছায়া বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে আঁকার শরীরটা কেমন ছম ছম করে।

এবার এলিসন এগিয়ে এল। বলল, আপা আসছ। আসো।

নিলুফার বলল, আঁকা, উনি তোমার খালা হন। সালাম দাও।

আঁকা হাত তুলে সালাম দিল।

এলিসন মাথা নেড়ে সালামের জবাব দিয়ে ভাগ্নিকে জড়িয়ে ধরে বলল, কেমন আছ মা?

ভালো।

কত বড় হয়ে গেছ। তোমার নাম তো আঁকা, না?

জি।

আমার নাম এলিসন। তুমি তো পড়াশোনা করছ, না?

জি।

কোন ক্লাসে পড়ো।

ক্লাস নাইনে। ভিখারুনিসায়।

নিলুফার বলল, মা কেমন আছে রে।

এলিসন বলল, আসো দেখো।

তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাসার ভেতরে।

এরই এক ফাঁকে আঁকা জিজ্ঞেস করল, মা বাসাটা কি আগের মতোই আছে।

নিলুফার বলল, অনেকটা। একটু পুরানা হয়ে গেছে। এই বাসার সাথে আমার কত স্মৃতি। ওই যে গাছটা ওই গাছে কত ঢিল মেরেছি। ওই পুকুরপারে বসে থাকতাম। মাছ ধরতাম। ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াতাম...

তারপর তারা বসার ঘর পেরিয়ে নিলুফারের মার ঘরে গেল।

নিলুফার মার দিকে তাকাল। মা শুয়ে আছেন। মাথার ওপর থেকে একটা স্যালাইন ঝুলছ।। মার মুখখানা এতটুকুন হয়ে গেছে। শুকিয়ে মা বিছানার সঙ্গে লেগে আছেন। নিলুফারের চোখ টলমল করছে।

এলিসন ডাকল, মা।

তিনি চোখ মেললেন।

এলিসন বলল, মা আপা আসছে।

মা বললেন, কে আসছে।

এলিসন বলল, লিজা আসছে।

লিজা! আসছে!

তিনি ভালো করে দেখে বলেন, আমার মেয়ে কোনটা? এইটা না ওইটা।

নিলুফার কাঁদছে।

এলিসন দেখিয়ে দিল, মা। এইটা তোমার মেয়ে আর এইটা তোমার নাতনি।

আমার নাতনি। বড়টা? আঁকা নাম?

নিলুফার ওরফে লিজা বলল, হ্যাঁ আঁকা নাম।

আঁকার নানি আঁকাকে কাছে টেনে নিলেন। আদর করলেন।

তারপর ডাকলেন নিলুফারকে, লিজা। আয়। তোর চেহারাটা অনেক বদলে গেছে। খালি গলাটা এক আছে। কতটুকুন ছিলি রে তুই। তোর বাবা তো তোর কোনো ছবিও ঘরে রাখবে না। এত রাগ। এলিসন। ওই পানের বাটাটা দে তো।

এলিসন একটা পানের বাটা এগিয়ে দেয়। মা সেখান থেকে লিজার একটা ১৮ বছর আগের ছবি বের করলেন।

এই একটা ছবি বহু কষ্টে লুকিয়ে রেখেছি। মাঝে-মধ্যে দেখি। কেমন আছিস রে মা।

নিলুফার কোনো রকমে বলল, ভালো আছি মা।

তারপর দুজনে কাঁদতে থাকল। তারপর এলিসন কাঁদতে থাকল। তারপর আঁকা কাঁদতে থাকল।

এলিসন চোখ মুছে বলল, আঁকা আসো। আমরা অন্য ঘরে যাই। বাসাটা পুরানা হলেও খুব সুন্দর। তোমার ভালো লাগবে।

নিলুফার বলল, যাও দেখো।

আঁকাকে এলিসন ঘরদোর দেখাতে লাগল।

লিজাকে তার মা বললেন, তোকে না দেখলে তো মরতেও পারতাম না। প্রাণটা যে বের হয়ে যায় নাই, তার কারণ তোকে দেখতে ইচ্ছা করছিল।

তুই এসেছিস। এবার আমি যীশুর কাছে চলে যেতে পারব।

তোমার অসুখটা কী?

অনেক অসুখ। হার্টে প্রবলেম। লিভার কাজ করছে না। এর মধ্যে ডায়াবেটিস। ডাক্তার বলে দিয়েছে, আর আশা নাই।

বললেই হলো। বাবা কই গেছেন।

চীনে গেছে। এখন চাইনিজদের সাথে ব্যবসা করতেছে তো।

তোমার এই অবস্থা। তাও গেল?

আমার তো অনেকদিনই এই অবস্থা। ব্যবসা তো করতে হবে। না? তোর কথা বল। তোর না দুই বাচ্চা।

হ্যাঁ। দুটোই মেয়ে। আরেকটা ছোট।

লেখা না নাম? আনলি না কেন?

ছোট তো। কী বুঝবে না বুঝবে। সেই জন্যে আনি নাই। মা আজকে উঠতে হবে।

এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি। ভাত খেয়ে যা।

না। বাইরে আমার দেবর গাড়িতে বসা। দেরি হয়ে যাচ্ছে না।

নিয়ে আয় ভেতরে।

না মা। যাই। আঁকা কই আঁকা?

আঁকা আর এলিসন এগিয়ে এল। আঁকার হাতে একটা কাগজের প্যাকেট। এলিসন তাকে নানা কিছু গিফট দিয়েছেন।

নিলুফার বলল, চলো মা দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমার চাচা বাইরে ওয়েট করতেছে না?

আঁকা বলল, চলো।

হাতে কী?

খালা দিল।

কেন এসব দিতে গেলি। আচ্ছা চলো। মা চলে যাচ্ছি।

আঁকার নানি বললেন, আচ্ছা। আর আসতে পারবি না?

আঁকার মা বলল, জানি না। দেখি...

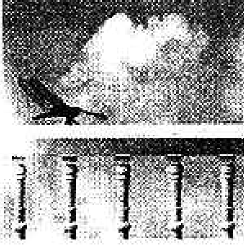
যেতে যেতে নিলুফার আবার পেছন ফেরে। মার দিকে তাকায়। মা সজল নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে চোখ ফেরাতে পারে না। চোখ মুছে

নিজেকে সামলে নিয়ে সে মেয়ের হাত ধরে। তারপর গটগট করে হাঁটতে থাকে বাইরের দিকে। গেট পর্যন্ত এলিসন এগিয়ে দেয়।

লিজার মা লিজার পুরানা ছবিটা আবার বের করলেন পানের বাটা থেকে।

তিনি সেই ছবিটার দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।



মোরশেদের ঘর। মোরশেদ শচীন টেন্ডুলকারের ম্যাচের ভিডিও দেখছে আর ব্যাটিং প্রাকটিস করছে শূন্যে ব্যাট ঘুরিয়ে। আঁকা এল। বলল, চাচা।

মোরশেদ সিডিটাকে পস দিয়ে বলল, কী মা?

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

কীসের কষ্ট মা। এদিকে আসো। দেখো শচীন টেন্ডুলকার কেমন করে ব্যাটিং করেন। কোন বলটা কীভাবে মারতে হয়। তোমার পায়ের পজিশন হলো আসল। খালি...

চাচা । আঁকা কাঁদতে থাকে।

কী হলো?

মাই মাদারস ফ্যামিলি ইজ আ ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলি।

সো হোয়াট?

অ্যান্ড মাই মাদার ইজ আ মুসলিম।

অফ কোর্স।

চাচা আমার এইসব চিন্তা করতে খারাপ লাগছে। আমার ঘুম আসছে না। চাচা আই এম বিকামিং সিক। প্রবাবলি আই এম বিকামিং ম্যাড।

পাগলি। তোকে এইসব নিয়ে ভাবতে কে বলছে। বড়রা এই পৃথিবীটাকে নানা কারণে জটিল করে রাখছে। এইসব নিয়া আমাদের একদম ভাবার দরকার নাই। আমাদের পৃথিবী সোজা। সত্য কথা বলব। সোজা পথে চলব।

চাচা আমরা তো দাদিকে সত্য কথা বলতে পারতেছি না...

সাংসারিক শান্তি রক্ষার জন্যে দু একটা ছোটখাটো চাপা... চলে...যা পাগলি।

কারিশমা তাদের বাসায় এলে আঁকা তাকে নিয়ে যায় ছাদে। তাদের ছাদটা সুন্দর। টবে চমৎকার সব অর্কিড। ক্যাকটাস। চারদিকে অনেক গাছও দেখা যায়। ঢাকা শহরে এমনিতেই কোনো গাছ চোখে পড়ে না, কিন্তু ছাদে উঠলে দেখা যায় কংক্রিটের নানা দরদালানের ফাঁক-ফোকরে সবুজ পাতার অদম্য বেড়ে ওঠা।

আঁকা কেন তাকে ছাদে নিয়ে এল? একটা ক্যাকটাসের কাঁটা নাড়তে নাড়তে কারিশমা ভাবে। আঁকার কান দুটো লাল হচ্ছে, নাকের পাশটা ফুলছে। সে ভীষণ রেগে আছে বোঝা যাচ্ছে। আর যেভাবে বলল, চল ছাদে যাই। না, সরাসরি প্রশ্ন করাই ভালো। কারিশমা মুখ খুলল, কী হইছে আমাকে বল। তুই আমার সাথে কথা বলতেছিস না কেন। আমাকে এভয়েড করতেছিস মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা কী?

আঁকা মুখ খোলে না। তার মুখে ঝড়ের পূর্বাভাস।

আরি বোবা নাকি। আশ্চর্য তো! আরে বাবা না বললে কীভাবে বুঝব কী হইছে? কারিশমা বলল।

আঁকা মুখে একটা ভীষণ ঘেন্নার ভাব ফুটিয়ে বলল, ছিছিছি কারিশমা! উনি আমার চাচা। তোর লজ্জা হয় না বন্ধুর চাচার সাথে এসএমএস এসএমএস খেলতে।

আশ্চর্য তো! তুইই তো আমাকে আগ বাড়ায়া নিয়া গেলি। আমি যে ক্রিকেটের ফ্যান এইটা তুই জানিসই। ক্রিকেট নিয়াই আমি আমার ওপিনিয়ন তোর চাচার সাথে শেয়ার করি। এটা নিয়া তোর মন খারাপ করার কী আছে?

না এইসব করবি না। আমার চাচা আমারই থাকবে।

আরি আশ্চর্য তো। তোর চাচাকে আমি কেড়ে নিচ্ছি নাকি।

আমি অতো বুঝি না। তুই আমার চাচাকে এসএমএস করবি না। ফোন করবি না। গল্প করতে হলে আমার সামনে করবি।

আঁকা। তুই তো পাগল হয়ে গেছিস। ফুল ম্যাড। এফ এম।

সত্যিই তো আমি পাগল হয়ে গেছি। আরো হবো। আমি পাগল... আমি পাগল...

আঁকা কাঁদতে লাগল। শূন্যের মধ্যে হাত-পা ছুড়ে এমন ভঙ্গি করতে লাগল যেন সে সত্যিই একটা পাগল।

কারিশমা বলল, আই এম স্যরি আঁকা। আমি বুঝতে পারি নাই তুই

জিনিসটাকে এইভাবে নিবি...ঠিক আছে...আর এসএমএস করব না।

আঁকা বলল, কারিশমা, তুই আমার সামনে থেকে ভাগ। তোকে দেখলেই আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। প্লিজ তুই সর। প্লিজ...

কারিশমা কী করবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। সে বলল, বললাম তো আমি আর এসএমএস করব না। এখন তুই নরমাল হ।

আমি আর নরমাল হতে পারব না রে। এই বাড়িতে থাকলে কেউ নরমাল থাকতে পারবে না। কেউ না। এই তুই ভাগ। ভাগ।

কতগুলো কাক একযোগে ডেকে উঠল সামনের বাড়ির দেয়ালে। কারিশমা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। আঁকা বসেই রইল ছাদে। সে ছাদেই থাকবে। সারারাত। সারাটা জীবন। তার দুচোখে জলের বন্যা।

আঁকা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তার যে ঠিক কী হয়েছে, বাড়ির কেউ বুঝতে পারছে না। নিলুফার যায় আঁকার কাছে– আঁকা খেতে আসো। সবার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি খেতে আসো।

আমি খাবো না। তুমি খাও। আঁকা টেবিলে হাতের ওপর মাথা রেখে বলল।

গিয়ে হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। আঁকা মাথা তুলে ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, আরে আমি বলতেছি খাবো না বলে হাতে ঝটকা মারে।

নুরজাহান বেগমও এলেন এই ঘরে, এই পাগলি কী হইছে চল।

আঁকা চিৎকার করে উঠল, কিছু হয় নাই। তোমরা যাও এখান থেকে। বের হয়ে যাও।

নুরজাহান আর নিলুফার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বিব্রত হয়ে।

নিজের শোবার ঘর থেকে মিনহাজুর রহমান হেঁকে যেতে লাগলেন, এই বাসায় কী হয়েছে? এই তোরা কেউ আমাকে বলছিস না কেন কী হয়েছে? এই মুনিরের মা মুনিরের মা। নুরি নুরি বউমা বউমা...

মোরশেদ এল আঁকার কাছে। বলল, আঁকা। অবুঝ হয়ো না। সিন ক্রিয়েট কোরো না। তুমি খুবই বুঝওয়ালা একটা মেয়ে। অবুঝ হয়ো না। চলো... খেতে চলো।

আঁকা খেপার ভঙ্গিতে বলল, তুমি আসছ কেন। যাও তুমি। তোমাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

জ্বলুক। চলো খেতে চলো...

তুমি এ ঘর থেকে না গেলে কিন্তু আমি হাতের কাছে যা পাবো তোমার মাথা বরাবর ছুড়ে মারব। সরো...

মোরশেদ বিপদ বুঝে কেটে পড়ল।

বিপন্ন ও চিন্তিত নিলুফার গেল মিতুর কাছে। বলল, মিতু। আঁকাকে নিয়ে তো চিন্তায় পড়লাম। ও তো দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ঠিক মতো খায় না। দায় না। সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। কী করি বলো তো?

মিতু চোখের চশমা হাতে নিয়ে খেলতে খেলতে বলল, ডাক্তার দেখাও। জাকির স্যারকে দেখাই আগে। তারপর উনি যদি বলেন কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে। কী বলো?

তুমি মেডিক্যালের ছাত্রী। তুমি তো ভালো বুঝবা।

ঠিক আছে আমি খবর দিচ্ছি জাকির স্যারকে।

নিলুফার কক্ষ ত্যাগ করলে মোবাইলে মিতু ফোন দিল জাকিরকে।

স্যার। আমি মিতু।

জাকির চিন্তিত স্বরে বলল, কী ব্যাপার মিতু?

স্যার। একদিন একটু সময় করে আমাদের বাসায় আসবেন।

কার সমস্যা? ড্রাইভার না বুয়া।

ইয়ারকি কইরেন না তো স্যার। আমার ভাস্তি। ওর একটু ডিপ্রেশনের মতো হইছে। আপনাকে তো আমাদের বাসার সবাই খুব বড়ো ডাক্তার মনে করে। আপনি যদি আঁকাকে একটু দেখেন ও সাইকোলোজিকালি বুস্ট আপ হতো।

কবে আসতে হবে।

আপনার সুবিধামতো স্যার। কালকে আসেন।

আচ্ছা।

আবার কাঁঠাল তরমুজ আনতে যাইয়েন না।

নানা। তা যাচ্ছি না।

আচ্ছা স্যার রাখি তাহলে।

রাখবা। রাখো।

মিতু ফোন রেখে দিল।

লেখা এতক্ষণ ভয়ের চোটেই আসেনি তার আপার কাছে। এখন এল। লেখা বিছানায় শুয়ে আছে। একটা রাবার ব্যান্ড আঙুলে পেচাচ্ছে। লেখা ভয়ে ভয়ে বলল, আপু। তোমার মন মেজাজের কী অবস্থা?

আঁকা মুখ না তুলে বলল, কেন?

আমি কি আজকে রাতে এখানেই ঘুমাব। নাকি আর কোথাও।

এখানেই ঘুমাবি। আর কোথায়?

লেখা বিছানায় শুয়ে পড়ল আঁকার পাশেই।

লেখা বলল, আপু। তুমি যে কেমন কেমন করো, আমার খুব খারাপ লাগে।

কেমন কেমন করি মানে। আমি কী করলাম?

পাগলের মতো করো। এইটা।

আমি মোটেও পাগলের মতো করি না।

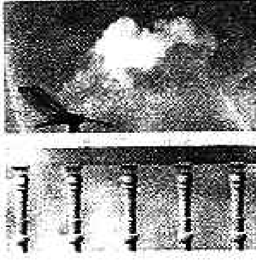
তুমি ঘুমাবা না?

ঘুমাব।

তুমি তো কিছু খাওনি। যাও খেয়ে আসো।

আচ্ছা যাচ্ছি।

আঁকা উঠল। ডাইনিং টেবিলে গিয়ে নিজে নিজে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে লাগল।



কারিশমা মেয়েটার মতলব মোরশেদ ঠিক ধরতে পারছে না। সারাক্ষণ এসএমএস পাঠাচ্ছে। মিসকল দিচ্ছে। সেদিন আবার মাঠে এসে হাজির। মোরশেদ তখন নেটে ব্যাটিং প্রাকটিস করছে। হঠাৎ শোনে মেয়েলি কণ্ঠ: আংকেল। মোরশেদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেল কারিশমাকে। আরে এই মেয়ে এইখানে কী করে? মোরশেদ এগিয়ে গেল। কী ব্যাপার তুমি এখানে?

কারিশমা উৎসাহের সঙ্গে বলল, আপনার প্রাকটিস দেখতে আসলাম।

প্রাকটিসের দেখার কিছু নাই।

আপনার সাথে আমার কথা আছে। চলেন আমার সাথে।

না, এখন আমি প্রাকটিস করব। এখন কথা বলতে পারব না।

করেন আমি দেখি।

যাও তো তুমি।

আমি থাকলে আপনার কী?

কিছু না। তুমি যাও।

এই মাঠ তো পাবলিক মাঠ। যে কেউ আসতে পারে। আমিও পারি। আপনি যান আপনার কাজ করেন।

না। যাও তো।

তাইলে আপনি আমার সাথে আসেন। কথা আছে।

আচ্ছা কী কথা এখানে বলো।

আপনার হইছেটা কী, আপনি আমাকে এভয়েড করতেছেন কেন।

কিছুই হয় নাই।

তাইলে আমি মেসেজ পাঠালে আপনি রিপ্লাই করেন না কেন?

আরে আমার সেটটা ডিস্টার্ব করতেছে। আমি কিছুই জানি না। তুমি এখন যাও তো। খেলার মাঠে ডিস্টার্ব কোরো না।

ওই কথা বললে আমি যাবো না।

কোন কথা?

ডিস্টার্ব করার কথা।

আচ্ছা লক্ষ্মী মেয়ে যাও। আমি পরে তোমার সাথে কথা বলব।

কারিশমা তাও নড়ে না মাঠ থেকে। শেষে মোরশেদই তাড়াতাড়ি রুমেলের মোটর বাইকের পেছনে চড়ে জায়গাটা ছাড়ল।

মুনিরের অফিসের ফোনে মাঝে-মধ্যে একটা অদ্ভুত ফোন আসছে। আজকে যেমন এল। ফোন বাজছে, অফিসের ফোন, অফিসিয়াল গলায় মুনির বলল, হ্যালো। ওপাশ থেকে ভেসে এল এক মায়াবী নারীকণ্ঠস্বর, কেমন আছেন?

মুনির প্রশ্নসূচক কণ্ঠে বলল, ভালো। হ্যাঁ কে?

আমি প্রকৃতি।

প্রকৃতি...ও আপনি...

আপনি কি আর কারো ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছেন?

না ঠিক তা না।

তাহলে আমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করছেন?

তাও না।

কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার জানালা দিয়ে বাইরে প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে। রাধাচূঁড়া গাছ হলুদ হয়ে আছে। কৃষ্ণচূড়া লাল। কী যে সুন্দর লাগছে জায়গাটা! প্রকৃতি কত সুন্দর!

আপনার নামও তো প্রকৃতি। আপনিও তাহলে সুন্দর।

আপনার দেখতে ইচ্ছা করছে? আমাকে?

নারে ভাই। মাটি কেটে খাই। প্রকৃতির দিকে তাকানোর সময় কই?

সময় করতে হয় না। আপনি যখন অফিসে আসেন তখন গাড়ির জানালা দিয়ে একটু তাকালেই হয়।

জানালা দিয়ে তাকালে কি আর আপনাকে দেখা যাবে।

ওমা আপনি আমাকে দেখতে চান নাকি।

নাহ। চাই না।

আপনি আমাকে দেখেছেন। আমিও আপনাকে।

কবে কখন বলুন তো।

আজকে বলব না। কাল বলব। এই সময়। আচ্ছা।

আচ্ছা।

ফোন রেখে দিল মুনির। তাজ্জব তো!

বাসায়, নিলুফারকে এই বিষয়ে কোনো কথাই বলল না মুনির। নিলুফারই বরং আগ বাড়িয়ে এসে অন্য নিরাপদ প্রসঙ্গ তুলল, শোনো। আঁকাকে নিয়ে তো খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

মুনির বলল, কেন বলো তো।

ও যেন কেমন কেমন করছে। ঠিকমতো খাচ্ছে না। ঘুমাচ্ছে না। তুমি একটু ওকে বলো না খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো করতে।

আচ্ছা বলছি। ওর সমস্যাটা কী ধরতে পারছ না।

না। কথা বলে নাকি। তোমারই তো মেয়ে। তোমার মতো চাপা।

না কথা বলো ওর সাথে। তুমি ওর মা। তোমার সাথে ও যত সহজ হবে আমার সাথে তত হবে নাকি।

তবু তুমি ওর সাথে কথা বলো। তুমি কথা বললে ও নিশ্চয়ই একটু সাপোর্ট পাবে।

আচ্ছা। বলব।

ডা. জাকির এসেছে এই বাসায়। মিতু তাকে ফোন করে ডেকে এনেছে। ডা. জাকির আজকে একটা পাতলা সাদা শার্ট পরে এসেছে। শার্টের ভেতরে তার গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। মিতু সেদিকে তাকাতে অকারণেই লজ্জা পাচ্ছে। মিতু তাকে নিয়ে গেল আঁকার কাছে। আঁকা বিছানায় বসে আছে দুই পা তুলে।

মিতু বলল, আঁকা। স্যারকে তো তুমি চেনোই। আমাদের স্যার। উনি এসেছেন তোমাকে দেখতে।

জাকির বলল, দেখতে না ঠিক। তোমার সাথে কথা বলতে। গল্প করতে। মিতু তুমি যাও আমার জন্যে এক কাপ চা করে আনো। আমি ওর সাথে একটু গল্প গুজব করি।

মিতু বাইরে চলে গেল।

জাকির বলল, আঁকা বলো কেমন আছো।

আঁকা স্বাভাবিক গলায় বলল, ভালো। আপনি ভালো?

হ্যাঁ আছি। তোমার মনটা কি একটু খারাপ?

না তো। কে বলল?

কে আবার বলবে। আমি তো ডাক্তার। আমি তো দেখলেই বুঝি।

না, আমার মন ভালো আছে।

ভেরি গুড। মন ভালো থাকলে দুনিয়ার সবকিছু ভালো লাগে। আর মন খারাপ থাকলে কোনো কিছুই ভালো লাগে না। পড়াশোনা হচ্ছে ঠিকমতো?

হ্যাঁ।

তোমার মনটা ঠিক কেন খারাপ। আমাকে বলো তো। আমি কাউকেই বলব না।

আমার মন ভালোই আছে।

আমি কাউকেই এত গম্ভীর হয়ে আমার মন ভালোই আছে বলতে শুনি নাই।

আঁকা জাকিরের ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল। জাকির দেখল, সব ঠিক আছে। তাই বলল সে মিতুকে, কই মিতু। ওকে তো অল রাইট দেখলাম। কোনো সমস্যা তো নাই।

তাইলে তো স্যার ভালোই।

ওকে হাসিখুশি রাখো। এই বয়সের ছেলেমেয়েরা খুব সেন্টিমেন্টাল হয় তো। ইমোশনের ওপরে চলে। তোমরা সবাই মিলে ওকে যদি অনার করো ওর মতামতের মূল্য দাও তাহলে ও অনারড ফিল করবে। সেল্ফ রেসপেক্ট তৈরি হবে— মিতু জাকিরের জন্যে চায়ের সাথে নানা পদের খাবারের ব্যবস্থা করেছে, সেসব রেখে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে জাকির বলল।

মুনির আঁকার কাছে গেল। মেয়েটার নাকি কী সমস্যা, একটু বোঝা দরকার। ইদানীং বাড়ির সবার সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। অফিস নিয়ে সে বেশি মেতে উঠেছে। জীবন যে কাকে কোথায় টেনে নিয়ে কোন আঠায় আটকে ফেলে!

আঁকা মা। সমস্যা কী? আঁকার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মুনির বলল।

আঁকা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। যেমন করে বিছানায় বসে ছিল, তেমনি বসে রইল।

মুনির বলল, পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে?

আঁকা কথার জবাব দিচ্ছে না।

তোমার মনটা কি খারাপ? কী হয়েছে আমাকে বলো। কথা বলো। মা, শোনো আমি তোমার বাবা তুমি কথা বলবে না। কথা না বললে তো হবে

না মা। মা কথা বলো। আঁকা...আচ্ছা বলো, কার ওপরে তোমার রাগ হয়েছে? কে তোমাকে বকা দিয়েছে? কেউ কি তোমাকে হার্ট করেছে? বাড়ির বাইরে কোনো সমস্যা হয়েছে?

এই রকম নানা প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না আঁকা। শেষে মাথা না তুলে বলল, বাবা আমার কোনো নানাবাড়ি নাই কেন বাবা?

মুনির বলল, তোমাকে তো তোমার মা নিয়ে গিয়েছিলই নানাবাড়িতে। কাজেই নানা বাড়ি আছে।

আমাদের সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ নাই কেন বাবা?

কারণ তোমার নানা। উনি তোমার মা আর আমার বিয়েটা মেনে নেন নাই।

সেটা নানার সমস্যা। কিন্তু তুমিও তো ওই বাড়ির সাথে সম্পর্ক রাখো না। রাখো।

মারে। দুনিয়াটা তো সোজা জায়গা নয়। জটিল জায়গা। তুই হচ্ছিস সরল সোজা আধুনিক মেয়ে। দুনিয়াটা অতো সরল সোজা আধুনিক নয়।

দুনিয়ার দোষ দিও না বাব। নিজেরা আধুনিক হলে দুনিয়াটাও আধুনিক হয়ে যাবে।

এইসব নিয়ে ভেবে ভেবে তুই মন খারাপ করে আছিস। এরকম করা ঠিক নয়।

বাবা আমার কিছু ভালো লাগে না বাবা। মুনির আঁকাকে কাছে টেনে নিলে আঁকা বাবার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। মুনিরের মেজাজটা তখনই নিলুফারের ওপরে চটতে থাকে। এই মহিলাই মেয়েটার এই সর্বনাশটা করেছে।

আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে মুনির ধরল নিলুফারকে–তোমার একদম উচিত হয় নাই আঁকাকে নিয়ে ওর নানিবাড়ি যাওয়া।

নিলুফার বলল, মা মারা যাচ্ছেন। আমি ভেবেছি ও ওর নানিকে দেখুক। মারও তো একটু ইচ্ছা হতে পারে তাই না।

মুনির বলল, এখন মেয়ে তো এই চিন্তা মাথা থেকে নামাতেই পারতেছে না। ছোট মাথায় এইসব চিন্তা নিতে পারে নাকি। কী যে তুমি করো না!

নিলুফার কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, আমি আবার কী করলাম।

মোনা এসেছে বাড়িতে। যথারীতি ঝড় তুলে। বাতাস ও বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে। সে দোরঘণ্টি টিপল অধৈর্য নিয়ে। নুরি দরজা খুলতেই তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিল—দরজা খুলতে এতক্ষণ লাগে। বদমাস কোথাকার?

তারপর নুরির প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে বিন্দুমাত্র দেরি না করে ভেতরে চলে গেল নুরজাহান বেগমের সামনে—মা বাসায় এত কিছু হয়ে যাচ্ছে তোমরা আমাকে একটা খবর দিবা না?

কী হইছে বাসায়? নুরজাহান বেগম ভ্রু কুচকে বললেন।

মোনা বলল, কী হইছে মানে? আঁকা আপসেট। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিছে। এইসব তোমরা আমাকে না বললে কী হবে আমি ঠিকই জেনে গেছি। এই বাড়ির কেউ তো আমাকে আপন ভাবে না। আমি জানি...

বাসায় কিছুই হয় নাই। আঁকাও ঠিক আছে। আগে আয়। দেখ। ঘটনা কী শোন। তারপর কথা বল।

রাখো। তোমাদেরকে আমার চেনা আছে।

মোনা গটগট করে চলল তার বাবার সামনে–বাবা কেমন আছো?

মিনহাজুর রহমান চশমাটা নাকের যথাস্থানে টেনে নিতে নিতে বললেন, কে?

বাবা আমি মোনা, তোমার বড়মেয়ে।

মোনা আসছিস। আয়। মারে এই বাসায় কেউ তো আমাকে দেখতে পারে না। খাবার দেয় না। আমি কালকে থেকে না খাওয়া।

হতেই পারে। বাসায় তো কোনো মানুষ নাই। সব জন্তু জানোয়ার। দাঁড়াও আমি তোমাকে খাওয়াচ্ছি। এই নুরি নুরি ভাত আন। যা। আমি বাবাকে খাওয়ায়া যাবো।

নুরি ভাত আনে। বাবাকে তুলে খাওয়ায় মোনা।

মোনা খাওয়াচ্ছে।

মিনহাজুর রহমান হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করেন। তারপর বলেন, আর খাবো না।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, নুরি নুরি তোর মাকে ডাক তো। এই মেয়ে তো আমাকে বিষ খাওয়াচ্ছে।

শুনে মোনা ক্ষেপে যায়, কী বললা বাবা, আমি তোমাকে বিষ খাওয়াচ্ছি। তোমাকে তো আজকেই মেন্টাল হসপিটালে এডমিশন করানো দরকার। যতসব পাগল-ছাগলের বাড়িঘর।

মোনা এরপরে ধরে মোরশেদকে—মোরশেদ। তুই ভাবিস না। তোর কেইসটা আমি ড্রপ আউট করে ফেলেছি।

মোরশেদ হাসিমাখা মুখে বলে, মানে!

ওই যে আঁকা বলল না, তার কোন বন্ধু তোকে মোবাইল সেট গিফট করেছে। এটা কিন্তু ঠিক না। একটা ছোট্ট মেয়ে কেন তোকে এতদামি জিনিস গিফট করবে।

তুমি আবার এইটা নিয়ে লাগলা। এখন আমি পাগল থামাই কেমন করে।

আমি সমস্যার সমাধান জানি।

জানো? বলো।

সমস্যার সমাধানের আগে তোকে জানতে হবে সমস্যার কারণ কী?

বলো কারণ কী?

এই জাতীয় সমস্যার মূলে আছে বুড়া বয়সে বিয়া না করা।

তুমি কার কথা বলছ?

তোর কথা।

আমি বুড়া?

অফ কোর্স বুড়া।

অফ কোর্স বুড়া?

হ্যাঁ বুড়া ঝামা।

তাইলে এখন হিসাব করো তুমি কী? তুমি আমার চেয়ে ১৪ বছরের বড়ো।

হ্যাঁ! আমার ছেলে ক্যাডেট কলেজে পড়ে। আমি তো বুড়িই। কিন্তু তোর মতোন এই রকম বুড়া ভাম হয়ে বিয়ে না করে বসে থাকি না। আর বাচ্চা মেয়েদের সাথে মোবাইলে কুটুর কুটুর মেসেজ মেসেজ খেলা, এইসব খেলি না।

তোমার কথার সারমর্মটা কী বলবা?

তুই বিয়ে করে ফেল।

আমি যে বিয়ে করব, আমার কোনো ইনকাম আছে?

নাই কেন? সেটা তো আমার দোষ না।

তা ঠিক। আমারই দোষ। এইসব নিয়ে ভাবার সময় আমার নাই। আমার ধ্যানজ্ঞান সবই এখন ক্রিকেট।

খবরদার তুই ক্রিকেটার হবার চেষ্টা করবি না।

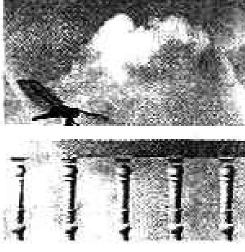
কেন?

আরে খালি হারে। কোনোদিনও তো দেখলাম না বাংলাদেশ কোনো খেলায় জিতছে, না! যে খেলায় নামা মনেই হারা। সেইটা তুই খেলতে যাবি কোন দুঃখে?

আমি যখন খেলব তখন হারবে না। ধরো তুমি একটা বিল্ডিং বানাবা। বা ধরো একটা ব্রিজ। তোমার পিলার লাগবে না? লাগবে। সেই পিলারটা কী? ফেইলর। ফেইলর ইজ দি পিলার অব সাকসেস। তো আমরা প্রচুর হারছি। আমাদের পিলার হয়ে গেছে প্রচুর। এইবার আমরা সেই পিলার দিয়ে সাকসেস বানাব। দেখো না কী করি। এখন কিছু মালপানি ছাড়ো। ক্রিকেট প্রাকটিস করা বহুত খরচাপাতির ব্যাপার। তার ওপর ধরো মোবাইল ফোন মেইনটেইন করতে হয়। ঝামেলা আছে। দাও দেখি কিছু টাকা পয়সা দাও।

টাকা কি আমি সঙ্গে নিয়া ঘুরতেছি। ওই ঘরে আয়। দিচ্ছি।

চলো।



আজ প্রথম প্রকৃতিকে দেখল মুনির। বনস্পতি রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে আলতো চোখে মেয়েটাকে দেখছে সে। সত্যি কথা বলতে কী, মেয়েটার সৌন্দর্য অভাবিতপূর্ব! যে মেয়েরা টেলিফোনে কারো সঙ্গে খাতির গড়ে তোলার চেষ্টা করে, সাধারণত তারা সুন্দরী হয় না। তাদের কণ্ঠস্বর মিষ্টি হয়। ফোনে চেহারা দেখানো যায় না বলে কণ্ঠের জাদুতে তারা প্রতিপক্ষকে বশীভূত করে। কাজেই মুনির যখন টেলিফোনে হওয়া কথা অনুসারে এই রেস্টুরেন্টে আসে, দুপুরবেলা, অফিস থেকে জরুরি কাজ আছে আমি বাইরে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে, তখন যে কোনো নবীন অভিসারীর মতো তারও বুক কাঁপছিল, সে আজকে নিজেকে একটু যত্ন করেই সাজিয়েছে, শার্ট-প্যান্ট পছন্দ করেছে যা পরলে তাকে ভালো লাগে বলে শোনা যায়, একটু সুগন্ধীও লাগিয়েছে চয়ন করে নিয়ে, সব সত্ত্বেও তার প্রত্যাশা খুব বেশি কিছু ছিল না। এসে বসেছিল সে এই রেস্তরাঁয়, কিন্তু মেয়েটির দেখা নাই, পরপর দুটো নারীকণ্ঠ তাকে সচকিত করে তুলেছিল, তৃতীয়বার এল মেয়েটি। না, নারী নয়, মহিলা নয়, তাকে কেবল মেয়েই বলা যায়। হয়তো তরুণী বলা যেতে পারে।

মেয়েটি শাড়ি পরেছে, দেশি তাঁতের শাড়ি, হয়তো নামি কোনো দোকানের নকশা করা শাড়ি, শাড়িতে কমলার আভাস আছে, দেশি নকশিকাটা আছে, কপালের টিপও কমলা, কানে মাটির গয়নার দুল। মেয়েটির চোখমুখ ধারাল, চোখদুটো ভাসা ভাসা নয়, তবে এক ধরনের তীক্ষ্ণতা আছে তাতে, বুদ্ধির ঝিলিক আছে।

সে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সরাসরি তার টেবিলেই এল, স্যরি। দেরি হয়ে গেল।

আপনি? প্রকৃতি!

হ্যাঁ হ্যাঁ। আমিই প্রকৃতি। শোনেন। আপনার জন্য সাজতে গিয়া দেরি

হয়ে গেল। শাড়ি পরতে পারি না। সময় লাগে।

হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।

থ্যাংক ইউ।

আসার পথে আড়ং-এ নেমে মুনির রুপার কানের দুল কিনে এনেছিল দুটো, তাই বের করে দিল সে।

মেয়েটি, প্রকৃতি বলল, কী ?

আপনার জন্যে ছোট্ট গিফট।

থ্যাংক ইউ।

কী খাবেন?

আপনি বলেন।

না, আপনার জন্মদিন। আপনি বলেন...

আচ্ছা দিচ্ছি অর্ডার। আমি আমার মতো দেই। আপনার কিছু খেতে ইচ্ছা করলে বলবেন।

ওয়েটার আসে। তানিয়া অর্ডার দেয়।

তারা খেতে খেতে গল্প করে।

মুনির বলল, সত্যি কথা বলেন তো আপনি কে?

মেয়েটি হাসে। তারপর বলে, সত্য কথা বলব? আমার নাম প্রকৃতি নয়। আমার নাম তানিয়া পারভিন। আপনাকে প্রথম দেখাতেই খুব ভালো লেগে গেছে। তখনই আমি আপনাকে টার্গেট করছি। আমি একদম টার্গেট বুঝছেন? আমি ঠিক করছি এই বুড়াবেটারে আমি ছাড়ব না।

এর আগে আপনার সাথে আমার কখনও দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ। হইছিল না। কী বললাম।

কোথায়? কবে?

আপনি মনে করেন...মেয়েটি, তানিয়া নাকি প্রকৃতির চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি।

না, মনে করতে পারছি না। বলেন না কোথায়?

না আপনাকেই মনে করতে হবে। আমি আপনাকে সেদিন থেকে ফলো করে আসছি। আর আপনি একদম ভুলে বসে আছেন। এটা হবে না।

আচ্ছা আপনি করেনটা কী?

আমি স্টুডেন্ট। পড়ছি। এমবিএ। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে।

আমার সাথে আপনার দেখাটা হয়েছিল কবে?

সেটাই তো কোশ্চেন। এইটা আপনি আমাকে বলবেন। আমি বলব না।

আচ্ছা থাকুক দেখি কোশ্চেনটা। আমি আরো ভাবি।

শোনেন। আমি কাউকে বেশিক্ষণ আপনি আপনি করতে পারি না। আর আমি তো আপনার মেয়ের বয়সী। আপনি আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন?

তাই তো!

শোনো। এখন থেকে আর আপনি আপনি না। এখন থেকে তুমি। ওকে?

মুনিরের ফোন আসে, মোবাইলে।

মুনির ফোনটা ধরে ব্যস্তভঙ্গিতে বলে, পরে ফোন করেন। আমি একটা মিটিঙে। তারপর তানিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা বলো। আজকে একটা বিশেষ দিন তোমার। তুমি একজন ইয়াং এট্রাক্টিভ গার্ল, আজকের দিনটা তুমি বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হৈচৈ করবা, তা না করে একটা বুড়া লোকের সাথে বসে আছো কেন?

আরে বন্ধুবান্ধব সব বোরিং। ওদেরকে নিয়ে কাল রাত ১২টা এক মিনিট থেকে হৈচৈ শুরু হয়েছে। বাদ দাও। তোমার সাথে আমার একটা কাজও আছে।

কী কাজ?

না। আজকে আমার বার্থডে উপলক্ষে তোমাকে ডেকেছি। আজকে এইসব বোরিং জিনিস নিয়ে আলোচনা করব না।

মুনির নানাকিছু ভাবে। মেয়েটি কে, তার কাছে কী কাজ নিয়ে এসেছে, তার কোনো প্রতিপক্ষ তাকে ফাঁসানোর জন্যে একে পাঠায়নি তো? হঠাৎ তার চোখে পড়ে, একটা পরিচিত নারীমুখ আরেকটা অপরিচিত মেয়েকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢোকে। মুনিরের চিনতে সামান্য দেরি হয়। এলিসন। নিলুফারের বোন।

এলিসনের সঙ্গে একদফা চোখাচুখিও হয় মুনিরের। সে বলে, চলো তানিয়া। অফিসে কাজ আছে।

চলো।

সুসংবাদ পৌঁছাতে হলে পয়সা খরচ করতে হয়। কিন্তু দুঃসংবাদ পৌঁছানোর জন্যে আপনাকে কোনো ক্লেশই স্বীকার করতে হবে না। ওটা বাতাসই বয়ে নিয়ে যাবে।

অফিস থেকে মুনিরের একজন সহকর্মী ফোন করে মুনিরের বাসায়।

ফোন ধরে গৃহপরিচারিকা নুরি। হ্যালো।

মুনির সাহেবের ওয়াইফ আছেন।

একটু ধরেন।

নুরি গিয়ে নিলুফারকে বলে, চাচি। ফোন। মুনির সাহেবের ওয়াইফরে চায়।

নিলুফার ফোন ধরে—হ্যালো।

মুনির সাহেবের ওয়াইফ বলছেন?

জি বলছি।

আপনার হাজবান্ড মুনির সাহেব আজ দুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন জানেন।

অফিসে।

অফিস থেকে কোথায় কাকে নিয়ে লাঞ্চ করতে গেছেন সেটা জানেন।

সেটা তো আমি জানতে চাই না।

এইখানেই তো ভুল করেন। পুরুষ মানুষকে এত স্বাধীনতা দিতে নাই।

হ্যালো আপনি কে বলছেন?

সেটা তো বলা যাবে না। শুধু জেনে রাখুন আপনার স্বামী আরেকটা সম্পর্কে জড়াচ্ছে। আজ দুপুরে উনি এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে লাঞ্চ করেছেন। তাকে দামি গিফট দিয়েছেন।

নিলুফারের সারাটা দিন ঢেকে যায় বিষণ্নতার মেঘে। সে যতবার ভাবে এইসব উড়োফোনের কথায় সে মোটেও কান দেবে না, এসব নিয়ে ভাববেও না, কিন্তু বারবার এই একটা চিন্তাই তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। কার সঙ্গে গেল মুনির? কোথায়? তাকে ফোনটাই বা করল কে? কাকে বলবে এখন সে এই কথা?

শেষে, থাকতে না পেরে, রাতের বেলা নিজেই জিজ্ঞেস করে বসল মুনিরকে, সারাটা দিন কেমন কাটল তোমার?

মুনির তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, এই তো এজ ইউজুয়াল। তোমার?

ভালোই। শোনো। আজকে না একটা ভূতুড়ে ফোন এসেছিল। বলে মিসেস মুনির আছেন। বললাম বলছি। বলে কি, আপনার হাজব্যান্ড আজকে কার সাথে লাঞ্চ করেছে, জানেন।

মুনির হঠাৎ রেগে গেল ভীষণ। চিৎকার করে বলতে লাগল, ভূতুড়ে ফোন, না! ভূতুড়ে ফোন। তুমি আবার ওই বাসার লোকজনের সাথে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছ তাই বলো।

নিলুফার ভয় পাওয়া কণ্ঠে বলল, কোন বাসা? কী বলছ তুমি?

আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে। বোঝো না কোন বাসা? নিশ্চয়ই এলিসন ফোন করেছিল।

এলিসন! ওর কথা আসছে কোত্থেকে?

আরে অভিনেত্রী রে। কী রকম আবার অভিনয় করে চলেছে! খবরদার আমার সাথে অভিনয় করার চেষ্টা করবা না। আর ওই বাড়ির লোকজনের সাথে যদি এতই মেশার শখ, যাও একেবারে গিয়ে ওঠো। আমার তো কোনো আপত্তি নাই। ওরাই তো তোমাকে নেয় না তাই না। আমি তো বলিনি মেশা যাবে না। সম্পর্ক রাখা যাবে না।

মুনিরের কণ্ঠস্বর চড়া। কথায় ঝাঁঝ। সেই উষ্মা গিয়ে পৌঁছয় পাশের কক্ষে, লেখার আর আঁকার কানে। লেখা বই নিয়ে বসে। আঁকাকে বলে, আপা ভয় লাগছে।

আঁকা বড়বোনসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, কেন রে।

ঝগড়া ভয় পাই।

চুপচাপ পড়ো। অন্যদিকে মন দেবার দরকার নাই।

পড়ায় মন বসছে না আপা...তার কণ্ঠস্বরে কান্না। আঁকা গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে সে কাঁদতে শুরু করে।

মিতু তার মেডিকালের পড়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এরই মধ্যে ভাইয়ার ঘর থেকে আসছে ঝগড়াঝাটির শব্দ। কেমন লাগে? সে হাতে বই নিয়ে পড়তে পড়তে মার ঘরে গেল। মাকে বলল, কী হলো আবার ভাইয়া ভাবির? কালকেই তো দেখলাম কত খাতির।

নুরজাহান বেগম উলের কাঁটা দিয়ে উল বুনছিলেন। চোখে চশমা। তিনি চশমার ওপর দিয়ে তাকিয়ে বললেন, কী জানি। এদের যে কী হয়! বউমাটার বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। সারাদিন খেটেখুটে ছেলেটা আসে, কী একটু মানায়া চলবে, নাতো কী না কী বলেছে।

আর এইটা যে জয়েন্ট ফ্যামিলি, এইখানে যে আরো লোকজন আছে, তাদেরও সুবিধা অসুবিধা থাকতে পারে, সেইটাও তো বোঝে-টোঝে না।

যত সব...

মিতু এই ঘরে এসেছিল ধীর পায়ে, কিন্তু বেরিয়ে গেল গটগট করে।

একদিন বিকালবেলা, তিনটা মতো বাজে, হেমন্তের বিকালগুলো হলুদ আর বিবর্ণ আর অনার্দ্র, মিতু কেবল একটু গড়িয়ে নিয়েছে কলেজ থেকে ফিরে, হঠাৎই নুরি এসে খবর দিল, ডাক্তার স্যারে আইছে।

কোন ডাক্তার? জাকির স্যার?

উত্তর হ্যাঁ-বোধক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল বাইরের ঘরের দিকে। মাঝপথে গিয়ে তার মনে পড়ল সে ঘরে পরার ম্যাক্সি পরে আছে, এটা পরে বাইরের মেহমানের সামনে যাওয়া যায় না। ঘরে ফিরে এসে তড়িঘড়ি করে কাপড় পাল্টে সে গেল বাইরের ঘরে। গিয়ে শুনতে পেল নুরি জাকির স্যারের কাছে পথ্য লিখে চাচ্ছে। নুরির কথা, ভালো ভালো পথ্য খাই না, আঙুর বেদানা, এই জন্যে স্যার মাথা ঘুরায়। একটু লেইখা দেন না।

মিতুর পায়ের আওয়াজ পেয়ে নুরি কেটে পড়ল।

স্যার, মিতু বলল।

জাকির বলল, তোমার মোবাইলের কী হয়েছে?

মিতুর মোবাইল হাতেই ছিল। সেটা চোখের কাছে নিয়ে বলল, রিংগার বন্ধ করা ছিল। আপনার মিসকল উঠে আছে। স্যরি। কলেজ থেকে এসে একটু ঘুমাই তো।

জাকির বলল, শোনো। একটা বিপদে পড়েছি। আমার বড়পার ম্যারিজ ডে। মা ফোন করে বলল, একটা গিফট কিনে দে। কী গিফট কিনে দেই বুঝছি না। তুমি একটু যাবা আমার সাথে।

মিতু বলল, চলেন... কত টাকা বাজেট...

চলো যাই। দোকানে গিয়ে বুঝি....

চলেন। আপনি বসেন আমি ব্যাগটা নিয়ে আসি। মিতু ব্যাগ আনতে গেল বটে, তবে শুধু ব্যাগই নিয়েই ক্ষান্ত দিল না। চোখেমুখে জল ছিটাল। চুলটা পরিপাটি করে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে ভাবল, জামাটাও পাল্টানো দরকার।

ডাক্তার জাকির এসেছেন টের পেয়ে নুরজাহান বেগম হুইল চেয়ারে মিনহাজুর রহমানকে ঠেলে নিয়ে এলেন ।

জাকির দাঁড়িয়ে সালাম দিল। আসসালামু আলাইকুম।

নুরজাহান বেগম বললেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম।

জাকির দাঁড়িয়েই বলল, আন্টি কেমন আছেন। আংকেলের শরীরটা কেমন?

মিনহাজুর রহামন বললেন, কে।

নুরজাহান বেগম বললেন, ডাক্তার জাকির। মিতুর টিচার।

মিনহাজুর রহমান বললেন, ডাক্তার আসছ। খুব ভালো করেছ। এই মহিলাকে একটু ওষুধ দিও তো।

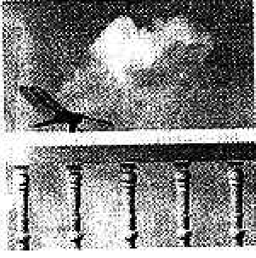
জাকির বলল, কেন?

মিনহাজুর রহমান বললেন, ওর তো কিছুই মনে থাকে না। আমাকে খেতে দেয় না। বলে দিয়েছি। খেয়েছ। এইমাত্র না খেলে। ওর কোনো দোষ নাই। বুড়ো হয়ে গেছে তো।

জাকির বলল, রাইট। মনে রাখতে পারে না। আমি ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। এবার থেকে মনে রাখতে পারবে।

মিতু রেডি হয়ে চলে এল–চলেন। আমি রেডি। এই আপনাকে ওরা কিছু খেতে টেতে দিয়েছে...

জাকির বলল, না কিছু খেতে দিতে হবে না। চলো...



মুনির অফিসে তার চেম্বারে বসে মন দিয়ে ফাইল দেখছে। সামনে বসা তার সহকর্মী কাদের সাহেব। মুনির মন দিয়ে ফাইল দেখছে। একটা হিসাব। যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে অডিটে আটকাবে, সন্দেহ নাই।

কাদের সাহেব বলল, মুনির ভাই। কালকে নাকি খুব সুন্দরী এক মেয়ের সাথে লাঞ্চ করলেন।

মুনির কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, কে বলল বলো তো।

খবর কি আর চাপা থাকে মুনির ভাই? সব খবরই পাওয়া যায়।

মুনির গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আমি বুঝতে পেরেছি কোত্থেকে তোমরা জেনেছ।

আরে কোত্থেকে খবর জানলাম এইটা ব্যাপার নাকি ঘটনা সত্য না মিথ্যা সেইটা ব্যাপার।

তোমার জন্যে কোনোটাই কোনো ব্যাপার না। আমি তো কাউকে না কাউকে নিয়ে লাঞ্চ করতেই পারি, তাই না। কিন্তু সেটা অফিসে রিপোর্ট করা আবার বাসায় ফোন করে জানানো...

কাদের আকাশ থেকে পড়ল, বাসায় ফোন করে জানিয়েছে, সর্বনাশ। কে?

আছে একজন। তুমি চিনবে না। আমি...তাকে পেলে কী যে করতাম...

মুনিরের স্থির ধারণা এলিসনই নিলুফারকে সব লাগিয়েছে। বোনকে সে বলতেই পারে। তাই বলে অফিসকে জানাবে? মুনিরের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। রাতে বাসায় ফিরে সে ধরে বসল নিলুফারকে।

শোনো। তোমার এই বোনটা তো ডেঞ্জারাস।

নিলুফার ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, তুমি কার কথা বলছ?

মুনির রাগান্বিত স্বরে বলল, কার কথা আবার? তোমার কয়টা বোন?

আমার বোন আসতেছে কোত্থেকে এইসবের মধ্যে!

তোমার বোন এলিসন। সে তোমাকে জানিয়েছে আমি কোথায় যাই কী করি। জানিয়েছে না? কার সাথে লাঞ্চ করি না করি এইসব। আবার অফিসে জানিয়েছে। কোনো মানে হয়?

আরে ও এর মধ্যে আসছে কেন। আমার মনে হয় তুমি কোথাও ভুল করছ। আমার কাছে তো ও ফোন করে নাই। একজন ভদ্রলোক করেছিলেন।

ভদ্রলোক? তাহলে তাকে দিয়ে ফোনটা ওই করিয়েছে।

আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ। সেই কবে তুমি ওকে দেখেছ। ওকে কি দেখলে তুমি চিনবা?

আমি ঠিকই চিনব। আমার হলো শকুনের চোখ। শোনো। আমাকে তুমি যত নিরীহ ধরনের মানুষ ভেবেছ ততটা নিরীহ আমি নই। ওই মেয়েকে অবশ্যই এর শাস্তি পেতে হবে। টিট ফর ট্যাট।

আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ।

না করছি না। মুনির রাগে চিৎকার করে ওঠে। হাতের জিনিস ছুড়ে মারে। একটা বডিস্প্রের কৌটা। সেটা মেঝেতে পড়ে জোরে আওয়াজ করে। তারপর মুনির গটগট করে হেঁটে সোজা বাড়ির বাইরে চলে যায়।

নুরজাহান বেগম টের পান, ওই ঘরে একটা কিছু হচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে তিনি ডাকেন নিলুফারকে–বউমা। এদিকে আসো। কী হইছে? মুনির চিৎকার চেঁচামেচি করছে কেন?

নিলুফার কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, জানি না মা। কে একজন ফোন করে বলল, আপনার হাজব্যান্ড দুপুরে কার সাথে লাঞ্চ করেছেন জানেন। এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সেই থেকে চিল্লাচ্ছে। বলছে আমার বোন নাকি আমাকে জানিয়েছে। আবার অফিসেও নাকি কে এইসব কথা লাগিয়েছে। দেখেন তো মা ...

আরে আশ্চর্য তো! তুই কার সাথে লাঞ্চে যাবি না যাবি সেটা তোর ব্যাপার। এইটা বাসায় জানালেই কি না জানালেই কি। এইটা নিয়ে চিল্লাচিল্লি করার কী আছে। পাগল নাকি! আবার বউয়ের ওপরে রাগ দেখায়। আমার বংশে তো এই রকম পাগল আসার কথা না। বউয়ের ওপরে রাগ দেখায়।

নিলুফারের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

দাঁড়াও ওর সাথে তুমি পারবা না। আমাকেই সামলাতে হবে। আমি ওকে টাইট দিচ্ছি।

বাইরে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে মুনির ফিরে আসে। নুরজাহান বেগম তাকে খাবার টেবিলে খেতে বসান। তার পাতে ভাত তুলে দিতে দিতে তিনি আস্তে আস্তে বলেন, শোন। সব সময় মাথা গরম করতে হয় না। প্রথমে মাথা ঠাণ্ডা রাখবি। তারপর ভেবে চিন্তে কাজ করবি।

মুনির ভাত খাওয়া থামিয়ে মার মুখের দিকে তাকায়।

নুরজাহান বেগম বলেন, বউমার সাথে কী নিয়ে চিল্লাচিল্লি করছিস?

না। তেমন কিছু না।

তেমন কিছু না হলেও বল।

আরে এমনি। সারাক্ষণ তোমরা মেয়েরাই কথাকাটাকাটি করবা। মাঝেমধ্যে আমি করব না।

আমাকে লুকানোর দরকার নাই।তুই ভাবছিস ও ওর বোনের সাথে বাবা-মার সাথে যোগাযোগ রাখছে।

তোমাকে কে বলল?

বউমাই বলল। বউমা আসলে ওই রকম মেয়ে না। আমি তো বুঝি। আমিও তো মেয়ে। নিজের বাপ-মা ছেড়ে আমাকেও তো তোর বাপের বাড়িতে উঠতে হয়েছিল। বউমা অন্য ধাতের মেয়ে। এতটা বছর গেল ও ওর বাপের বাড়ির সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে নাই। আজকে হঠাৎ করে রাখতে আরম্ভ করবে কেন। আমি ওকে বকা দেই, সে আমি রাগ কন্ট্রোল করতে পারি না বলে। তাই বলে তুই কেন চিল্লাচিল্লি করিস?

না মা। তুমি এ সব কিছু বুঝবা না।

আমি বুঝব না। তাই তো এখন তুই ভাববি। এখন বড় হইছিস্। এই রকমই তো বলবি।

মুনির মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপর নীরবে ভাত খেতে শুরু করে।

তানিয়া মেয়েটা আবার ফোন করেছে। মুনির যথারীতি তার অফিসে। তাকে কথায় কথায় বলে, এই তুমি বলছিলে আমার সাথে কী যেন কাজ আছে।

তানিয়া হাসে, আছেই তো।

বলো। কী কাজ?

পরে বলব।

আমার কিন্তু গোটা ব্যাপারটা রহস্যময় লাগছে।

রহস্যের কিছু নাই।

ইন ফ্যাক্ট কেউ যদি আমাকে বলে তোমার সাথে আমার একটু কথা আছে। না শোনা পর্যন্ত আমার শান্তি হয় না।

তাহলে তো বলতেই হয়।

বলো।

তোমাকে আমার খুবই ভালো লেগে গেছে। আমি তোমাকে চাই।

কথা ঘোরাচ্ছ।

নাহ।

আসলে কে তোমাকে এসাইন করেছে বলো তো।

কেউ না। আমিই আমাকে এসাইন করেছি।

তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল কোথায় এটাই তো তুমি আমাকে বললে না।

তোমার না বলার কথা।

আমাদের অফিসের পিকনিকে?

নাহ।

তাহলে?

তুমি বলো।

না পারলাম না।

দশটা কোশ্চেন করো। আমি হ্যাঁ বা না বলব। দেখি পারো কিনা।

ঢাকায় দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

দিনে দেখা হয়েছিল না রাতে?

এইভাবে প্রশ্ন কোরো না। হ্যাঁ বা না দিয়ে যাতে করতে পারি। বলো, রাতে দেখা হয়েছিল?

আমি হ্যাঁ বা না বলব। তাতেই তো তুমি উত্তর পেয়ে যাবে।

আচ্ছা রাতে দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

এটা কি পারিবারিক অনুষ্ঠান ছিল?

না।

অফিসিয়াল অনুষ্ঠান ছিল?

না। তোমার অফিসের না।

কালচারাল অনুষ্ঠান ছিল।

কাইন্ড অফ।

বুঝতে পেরেছি। ওই যে একটা নতুন ড্রিংকস বাজারে আসছে, তার লঞ্চিং প্রোগ্রাম।

হইছে। হইছে।

সেইখানে তুমি আমাকে টার্গেট করলা কীভাবে।

আমি তোমার পাশের টেবিলে বসেছিলাম। তুমি একটার পর একটা কী জোকস বলছিলা। আর টেবিলের সবাই হাসছিল। তাতেই আমার তোমাকে পছন্দ হয়।

শুধুই এই।

না আরো আছে।

প্রগ্রাম শেষ হলে ওদের এমডি এসে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিল।

রাইট।

আমি ওই এমডির কাছে রিচ করতে পারছি না। তুমি যদি বলে দাও একটা ঘটনা ঘটতে পারে।

কী?

ওরা আরো তিনটা নতুন ড্রিংকস নামাচ্ছে। মডেল দরকার। ওদের এজেন্সির সাথে আমার কথাবার্তা চলছে। ওরা বলছে এমডির কাছে সব আটকে আছে।

আমাকে কী করতে হবে।

এমডিকে বলে দিতে হবে আমার কথা। তাহলেই আমি বড় মডেল হয়ে যাবো। প্লেন্টি অফ মানি। ফেম।

তুমি আমাকে না পটিয়ে সরাসরি ওই এমডিকে পটালেই তো পারতা।

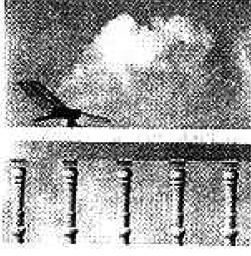
আই ট্রায়েড এন্ড কুড নট রিচ হিম।

ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনির। সে আর কথা বলার উৎসাগ পাচ্ছে না। মেয়েটা আসলে তাকে পছন্দ করে তার কাছে আসে নাই। সে তাকে ওপরে ওঠার মই হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। গাছে তুলে মই সরিয়ে দেওয়ার

প্রবাদটা তার বেলায় উল্টো করে ব্যবহৃত হবে, মইয়ের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে মেয়েটা মইটাকে লাথি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে গাছের মগডালে চড়ে বসে থাকবে।

সে ফোন রেখে দিয়ে অফিসের জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। ৭ তলার ওপর থেকে নিচের ব্যস্ত ঢাকার রাজপথ। আকাশটা ধাতব। রোদ মরে আসছে। কী যে হাহাকারের মতো লাগছে।



মিনহাজুর রহমান বেল টেপেন। নুরি। নুরি।

নুরি আসে।

মিনহাজুর রহমান বলেন, আমাকে পেপার পড়ে শোনাবে কে। তুই পারবি?

না দাদা। আমি তো পারি না।

মিতুকে ডাক।

ফুপুয় আইব না। হের পড়া আছে না। মেডিকালের পড়া।

তাইলে মোরশেদকে ডাক।

চাচায় তো ক্রিকেট খেলা দেখে।

তাইলে কাকে ডাকতে পারবি। কে আসবে?

আঁকা আপারে কই।

বল।

নুরি চলে যায়। আঁকাকে পাঠিয়ে দেয়।

দাদা ডেকেছ। আঁকা বলে।

হ্যাঁ বুবু। আজকের পেপারটা একটু পড় না।

আঁকা খবরের শিরোনাম পড়ে শোনায়। সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৩ জন হতাহত। চট্টগ্রামে দুইদলের সংঘর্ষ। পুলিশসহ আহত ১৪।

মিনহাজুর রহমান সেইসব শুনে মন্তব্য করেন– কোনো সুখবর নাই না।

আঁকা বলে, নাই। দাদা তোমার চোখের ছানিটা কাটলেই পারো।

আমি কাটব?

ডাক্তার দিয়ে কাটালেই পারো।

তাই তো। কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েদের তো সময় হয় না ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার।

আচ্ছা মাকে বলব মা নিয়ে যাবে।

হ্যাঁ। বউমাকে বলিস। বউমা ঠিকই নিয়ে যাবে।

কাদের সাহেব আজকে অফিসে মুনিরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য দিল—স্যার। আপনি স্যার কাকে নিয়ে লাঞ্চ করবেন না করবেন এটা তো আপনার ব্যাপার না?

মুনির বলল, কেন বলেন তো।

আরে হুমায়ুন সাহেব এটা দেখে ফেলেছেন। দেখুন। আপনার বাসায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে! কী রকম আস্পর্ধা বলেন।

হুমায়ুন সাহেব এটা করেছে আপনি শিয়োর?

হ্যাঁ। আমাকে বলেছে। আরো অনেকেই জানে।

ঠিক আছে আপনি যান। আমি দেখছি।

কাদের সাহেব চলে গেলে মুনির ডেকে পাঠাল হাসান সাহেবকে, টেবিলে দুইহাত তুলে এগিয়ে বসে বলল, হাসান সাহেব!

জি স্যার।

আচ্ছা আপনি কি জানেন আমি বুধবার দুপুরে কাকে নিয়ে লাঞ্চ করেছি?

না স্যার।

কিছুই জানেন না?

স্যার একটা কথা বলি?

বলেন।

কথায় বলে, হাড্ডি কখনও হয়না গোশ্‌ত, আর কলিগ কখনও হয় না দোস্ত।

কথাটা তো আপনি ভালো বললেন। আবার বলেন তো।

হাড্ডি কখনও হয় না গোশ্‌ত, আর কলিগ কখনও হয় না দোস্ত।

ঠিক বলছেন। এটা কি ঠিক হুমায়ুন সাহেব আপনাদের আমি কার সাথে লাঞ্চে গিয়েছিলাম না গিয়েছিলাম এটা নিয়ে কিছু বলেছেন?

হাসান সাহেব চুপ করে থাকেন।

মুনির বলে, হাসান সাহেব। চুপ করে থাকবেন না। আমি অন্য আরেকজনকে সন্দেহ করেছি। অন্য আরেকজনকে আমি দায়ী করেছি। একজনের অপরাধে আরেকজন শাস্তি পাক এটা নিশ্চয়ই আপনি চান না।

বলেন তো কে অফিসে বলেছে...

যার কথা বললেন উনিই স্যার।

উনি কি আমার বাসাতে ফোনও করেছেন?

আমি তো দেখিনি। তবে শুনেছি...

কী শুনেছেন?

হুমায়ুন সাহেব ফোন করে ভাবিকে বলেছেন....

ঠিক আছে। আপনি যান...

হাসান সাহেব চলে যায়।

মুনিরের কান গরম হতে থাকে। সমস্ত চোখমুখ ঝাঁঝা করছে। সে বাথরুমে ঢোকে।

বেসিনের আয়নার সামনে দাঁড়ায়। কল খুলে চোখে-মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা দেয়।

কী খবর? মনটা খারাপ?

হ্যাঁ। মনটা খারাপ।

কেন? অফিসে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে?

হ্যাঁ। শুধু সেটাই নয়। তানিয়ার ব্যাপারটাতেও মনটা দমে আছে।

কী রকম?

আমি ভেবেছিলাম এই রহস্যময় মেয়েটা আমার কাছে এসেছে আমারই আকর্ষণে। আমার প্রতি মুগ্ধ হয়ে। এখন দেখছি ব্যাপার সেটা নয়। সে এসেছে তার নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। এইখানে আমি একটু ডিজএপয়েন্টেড।

কী? প্রত্যাশাভঙ্গ হয়েছে?

হুঁ।

কী আর করবা? মেনে নাও। নিজের ঘরে ফিরে যাও। মনটা এই কদিন তোমার বিক্ষিপ্ত ছিল। এবার শান্ত হও।

তাই করতে হবে। তাছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না।

মুনির নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে।

আজ মুনির তাড়াতাড়ি ফিরে আসে বাসায়। তার মনটা বেশ নির্ভার। সে হাল্কা মন নিয়ে প্রথমে যায় নুরজাহান বেগমের কাছে। হাসিমুখে বলে, কেমন আছ মা?

নুরজাহান বেগম বলেন, ভালো। তুই কেমন আছিস বল।

ভালোই।

তোর মেজাজটা আজকে ভালো মনে হচ্ছে।

মেজাজ তো আমার সব সময়ই ভালো থাকে।

মুনির সেখান থেকে যায় মিনহাজুর রহমানের কাছে–বাবা। কেমন আছ?

কে?

বাবা আমি মুনির।

বাবা মুনির। ওরা তো আজকে আমাকে ভাত খেতে দিল না।

বাবা আপনার কি খিদা লাগছে। আরেকবার খাবেন।

আরেকবার বলছিস কেন। ওরা আমাকে গত তিনদিন ধরে ভাত খেতে দেয় না।

এখন খেতে চাও তুমি।

চাই।

আচ্ছা আজকে আমি তোমাকে নিজ হাতে খাওয়াব।

মুনির সেখান থেকে গেল লেখা আর আঁকার ঘরে। ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে বলল, লেখা কী করছ?

লেখা ছবি আঁকছিল। সে কোনো কথা বলে না।

আঁকা পড়ছিল। সে যেমন পড়ছিল তেমনই রইল।

মুনির আবার বলল, কী করছ লেখা মা?

লেখা মাথা না তুলে বলল, কিছু না।

মুনির বলল, কিছু না কেন। ছবি আঁকছ তো।

লেখা এই কথার কোনো জবাব দিল না।

মুনির আবার বলল, আঁকার কী অবস্থা?

আঁকা চেয়ার থেকে উঠে মুনিরের দিকে মুখ করে একটা দেয়াল ঘেষে দাঁড়াল। বলল, এই তো।

মুনির বলল, কী রে তোরা দুইজন এত গম্ভীর কেন।

লেখা বলল, আমরা তোমাকে ভয় পাই।

মুনির বলল, ভয় পাস। আমাকে ! কেন?

লেখা বলল, তোমার অনেক রাগ! তাই।

মুনির বলল, রাগের কিছু নাই। চল এক কাজ করি। তোদের

দাদাভাইকে সবাই মিলে ভাত খাওয়াই। খাওয়াবি!

আঁকা বলল, দাদা তো একটু আগেই ভাত খেয়েছে।

মুনির বলল, আবার খাবে। পেটে জায়গা থাকলে খেতে পারবে, না হলে পারবে না। তাই না!

লেখা বলল, চলো।

মুনির বলল, আঁকা। তুই যা। ভাত বেড়ে নিয়ে আয়। আমি দেখি তোদের মা কী করছে। বাবাকে ভাত খাওয়ানোর এক্সপার্ট তো আসলে সে। তাই না?

মুনির যায় তার শোবার ঘরে, নিলুফারের আছে। গলায় আমোদের ভাব ফুটিয়ে বলে, কী অবস্থা নিলু তোমার।

নিলুফার ঘাড় বাঁকা করে তাকায়।

মুনির বলে, শোনো। বাবাকে সবাই মিলে ভাত খাওয়াব। আমি লেখা আর আঁকা। তুমিও আমাদের সাথে জয়েন করতে পারো।

নিলু রাগ করে এই ঘর ছেড়ে চলে যায়।

মুনির হতোদ্যম হয় না।

লেখা আঁকা আর মুনির মিলে দাদাকে খাওয়ায়। দাদা খানিকটা খান। খানিকটা ফেলেন।

মুনির আবার আসে নিলুফারের কাছে।

মুনির বলে, নিলু কাছে আসো।

নিলুফার বলে, খবরদার আমাকে এই নামে ডাকবা না।

রাগ মনে হচ্ছে!

আবার বেহায়ার মতো জিজ্ঞাসা করে রাগ নাকি।

শোনো। তোমাকে আমার একবার একটু স্যরি বলার আছে। তোমাকে কে ফোন করেছিল, আমি জানতে পেরেছি। না। এলিসন নয়। আমার অফিসেরই একজন আমার পিছে লেগেছে। আর অযথা আমি তোমাকে কিনা কি বললাম। স্যরি নিলু।

নিলুফার চোখ মোছে, বলে, এখন আর স্যরি বলে কী হবে। কত খারাপ ব্যবহার তুমি করছ।

করেছি। স্বীকার করছি ভুল করেছিলাম। সেইজন্যেই তো বলছি স্যরি। এরপর আর কথা থাকে না।

এক কাপ চা খাবা। বানায়া এনে দেব।

দাও এক কাপ। শোনো দুই কাপ আনো। আজকে বারান্দায় এক সাথে বসে দুজন চা খাবো।

মিতুর ক্লাসমেট শুভ্রা এসেছে এই বাসায়। একটা ছোট্ট সমস্যা হয়েছে। রাত বাজে দশটা, কিন্তু শুভ্রার গাড়ি আসছে না। গাড়ি গেছে এয়ারপোর্টে, কিন্তু ফ্লাইট লেইট। অগত্যা মিতু এসে নিলুফারকে বলল, ভাবি তোমাদের গাড়িটা একটু দাও না। গাড়ি দেওয়া যাচ্ছে না কারণ ড্রাইভার বিদায় নিয়েছে এরই মধ্যে। তখন নিলুফার বলল, দাঁড়াও এক মিনিট আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। সে গেল মোরশেদের কাছে।

মোরশেদ। একটা কাজ করবা?

মোরশেদ সোৎসাহে বলল, তুমি বললে অবশ্যই করব।

কিছুটা সময় একজন সুন্দরী তরুণীর সাথে কাটাবা!

সর্বনাশ। এর চেয়ে চিড়িয়াখানায় বাঘের খাঁচায় কিছুক্ষণ থাকতে বলো। সেটা সহজ হবে।

না ইয়ারকি না। শুভ্রা মেয়েটা বিপদে পড়েছে। ওর গাড়ি আসার কথা, আসতে পারবে না। আবার আমাদের ড্রাইভারও ছুটিতে। তুমি কি একটু গাড়ি ড্রাইভ করে দিবা। শুভ্রাকে পৌছে দিয়েই চলে আসো।

দাও দাও আমারও ড্রাইভিং প্রাকটিসটা ভালো হবে। শোনো। গাড়িতে ঘষা-টষা লাগলে কিন্তু মন খারাপ কোরো না।

আমার আর মন। এতো ছোট ব্যাপারে মন খারাপ করতে পারলে তো হতোই। ঠিক আছে তাহলে বেরিয়ে পড়ো!

শুভ্রাকে নিয়ে বেরিয়েছে মোরশেদ। গাড়ির দরজা খুলে দিতে দিতে মোরশেদ বলল, শোনো। আমি কিন্তু গাড়ির বাম পাশটা কতদূর যায় এটা দেখিও না, বুঝতেও পারি না। ডান পাশটা আমি সামলাব, তুমি বাম পাশটা দেখবা। পারবা না!

কী বলেন?

ভয় পেয়ো না। যাত্রীদের জীবন বীমা করা আছে। কোনো রকমে যদি মরতে পারো, তোমার ফ্যামিলি ভালো টাকা পাবা ।

মরলে তো মিটেই গেল। কিন্তু যদি হাত পা ভেঙে পড়ে থাকি।

তাহলেও টাকা পাবা। হাত ভাঙলে টাকা। চোখ নষ্ট হলে টাকা। তুমি

কোনো চিন্তা কোরো না। ওঠো। ওঠার আগে শেষবারের মতো দুনিয়াটাকে একবার দেখে নাও।

শুভ্রা ভয়ে ভয়ে উঠল গাড়িতে। সুন্দরী মেয়েরা যাই করে, তাই ভালো লাগে। ভয়ার্ত শুভ্রাকেও খুব সুন্দর লাগছে।

মোরশেদ হেড লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিল। অটোমেটিক গাড়ি। ব্রেক থেকে পা সরাতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

মোরশেদ রেডিও অন করল। রেডিও টু ডে। ওরে কত কথা বলে রে। একটু পরে গান শুরু হলো। আমি তো প্রেমে পড়িনি, প্রেম আমার উপরে পড়েছে। আমাকে ভেঙ্চেুরে চুরে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো...

মোরশেদ বলল, আমাদেরও এই পরিণতিই হবে। ভেঙে-চুরে চুরে-ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো...

শুভ্রা বলল, ভালোই তো চালাচ্ছেন মোরশেদ ভাই। অযথা ভয় দেখায়েন না তো।

আরে কিসের ভালো। হেড লাইটের আলোয় সব কিছু আমি দুইটা দুইটা করে দেখতেছি। আমি জানি না কই থেকে কই যাচ্ছি।

মোরশেদ নিরাপদেই নামিয়ে দিল শুভ্রাকে। তার বাসার সামনে।

শুভ্রা বলল, মোরশেদ ভাই থ্যাংক ইউ।

মোরশেদ বলল, আমাকে থ্যাংকস দেওয়ার দরকার নাই। আল্লাহকে দেও। উনি নিরাপদে এনেছেন বলে আপনার সব পার্টস ঠিকঠাকমতো পৌঁছল। এখন আমার জন্যে দোয়া করেন। আমি যেন ঠিকমতো পৌঁছাতে পারি।

আরে কিচ্ছু হবে না। আসেন। এক কাপ চা খেয়ে যান।

কেন বলো তো।

আসেন।

না আমি ভাবলাম ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাওনা হলো এক কাপ চা। সেটা তুমি শোধ করতে চাচ্ছ।

ছি কী বলেন!

তুমি এক কাজ কোরো। তোমার গাড়িতে আমাকে একদিন একটা লিফট দিয়ে দিও। শোধ হয়ে যাবে। আসি। প্রে ফর মি।

হ্যাভ আ সেফ ট্রিপ।

থ্যাংক ইউ।

মোরশেদ বাড়ি ফিরে এল নিরাপদেই। গাড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে ঘরে ঢুকল।

শুভ্রা ফোন করল মিতুকে—মিতু। মোরশেদ ভাই ফিরছে?

মিতু বলল, মনে হয়। কেন?

আরে ভদ্রলোক যা করল। বলে আমি ডান পাশটা দেখি তুমি বাম পাশটা দেখো। বলে মরলে চিন্তা নাই ইনশিয়োরেন্সের টাকা ভালো পাওয়া যাবে।

আরে ওর কথা তো এই রকমই। ধর দিচ্ছি কথা বল।

মিতু মোবাইল নিয়ে গেল মোরশেদের কাছে—ভাইয়া ফোন।

কে? মোরশেদ জানতে চাইল।

কথা বলো।

মোরশেদ ফোনটা হাতে নিয়ে বলল, হ্যালো।

শুভ্রা বলল, মোরশেদ ভাই ঠিক মতো পৌছাইছেন?

মোরশেদ বলল, ঠিক মতো দোয়া করছিলা তো।

মানে?

তুমি যেমনটা চাইছ। তেমনি হইছে। আমি মোটামুটি ঠিকভাবে পৌছাইছি। সব পার্টস আসছে নাকি গুনে নেই দাঁড়াও। হাতের দশ আঙুল পায়ে দশ কত হইলো বিশ। দাঁড়াও গুনতে মনে হয় ভুল হচ্ছে ১৯টা হয় কেন, ও বুঝছি যে আঙুল দিয়ে গুনতেছি সেইটা ধরি নাই। ঠিক আছে ঠিক আছে।

মাথা ঠিকমতো আসছে?

এই মিতু আমার ঘাড়ের ওপরে দেখ তো। মাথা দেখা যায়।

মিতু কী বলে?

হাসে।

আর মন ঠিকমতো আসছে তো।

ওই পদার্থ আমার আগে থেকেই নাই। এইটা নিয়ে তুমি চিন্তাই কোরো না। ফোন করছে কে। তুমি না মিতু।

মানে?

বিল উঠতেছে কার?

মিতু করছে। ওর।

তাইলে রাখি। নাইলে আবার আমার কাছে কার্ড চেয়ে বসবে।

নানা। আমিই করছি।

ও তাইলে মিতুর সাথে আরো গল্প করো।

মিতু বলল, হইছে। কেটে দাও।

মোরশেদ আচ্ছা রাখি বলে লাইন কেটে দিল।

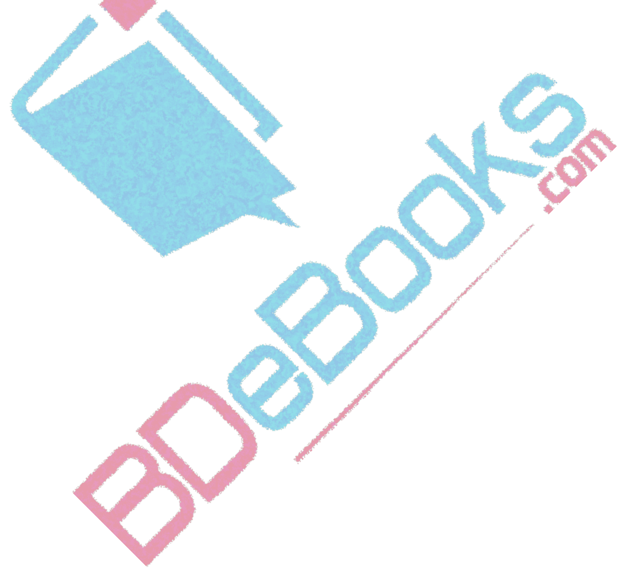
মিতু বলল, ভাইয়া আমি কোথাও যেতে চাইলে তো আমাকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাবা না। আর শুভ্রা বলল এক দৌড়ে চলে গেলা। ব্যাপার কী?

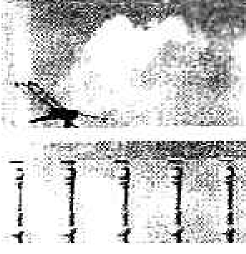
মোরশেদ বলল, আরে এদেরকে যত তাড়াতাড়ি এই বাড়ি থেকে সরানো যায়, বুঝলি না।

আর তোর বেলায় আমরা চাই তুই আমাদের সাথে সাথে থাক।

কথার জাদুকর। আমাকে খাওয়াবা। তোমাকে এই চান্স দিছি বইলা।

তোর বন্ধুর কাছে খা। কত বড় ব্যাটসম্যানের পাশে বসেছে। আজকে তো বুঝবে না। পরে বুঝবে। তখন আমি চিনবই না।





শুভ্রাকে দেওয়া লিফটটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ এসে গেল মোরশেদের জীবনে।

মিতুদের বাসা থেকে শুভ্রা বেরিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণ মিতুর সাথে পড়ছিল।

সিঁড়িতে দেখা মোরশেদের সঙ্গে। মোরশেদ ক্রিকেট খেলে ঘর্মাক্ত কলেবরে ফিরছে।

শুভ্রা ডাকল, মোরশেদ ভাই।

মোরশেদ শূন্যে ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, কী শুভ্রা। পড়া শেষ?

আপাতত।

আজকে গাড়ি আছে?

আছে। আপনাকে কোথাও পৌছায়া দিতে হবে। বলেন? নামায়া দিয়া যাই। কথা ছিল শোধ করে দিব।

এই অবস্থায়। দাঁড়াও একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। তুমি বসো।

সিরিয়াসলি যাবেন?

হ্যাঁ। সিরিয়াসলি যাবো।

নামেন তাইলে তাড়াতাড়ি।

আসো তুমি। বাসায় বসো।

আমি গাড়িতে বসি। আপনি তাড়াতাড়ি নামেন।

গাড়িতে বসবা কেন বাড়ি থাকতে?

আরে মিতুর কাছে বিদায় নিয়া আসলাম। ও কী বলবে।

ওর কি বলার আছে। আচ্ছা চলো ওকেও নিয়া নেই।

নিয়ে কই যাবো।

চলো ফুসকা খেয়ে আসি। আজকে আমি একটা খ্যাপ মারতে গিয়েছিলাম। টাকা পাইছি।

কীসের খ্যাপ।

আরে আমাকে হায়ারে নিয়া গিয়েছিলাম ক্রিকেট খেলতে। খেলে টাকা পাইছি। চলো তোমাদেরকে ফুসকা খাওয়াই।

চলেন – শুভ্রা মোরশেদের পেছন পেছন হাঁটতে থাকে।

মিতু বাইরের ঘরে বসে টিভি দেখছে। টিভিতে একটা রান্নার রেসিপি দেখাচ্ছে। মিতু সেটাই আগ্রহভরে দেখছে।

মোরশেদ আর শুভ্রা এল সেখানে। মোরশেদ বলল, মিতু। তোকে হাফ এন আওয়ার সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে রেডি হয়ে নে। আমিও একটু চেঞ্জ করে আসি।

মিতু বলল, কই যাবা?

মোরশেদ বলল, আর বলিস না। শুভ্রা কিছুতেই ছাড়তেছে না। বলে ফুসকা খাওয়াতে নিয়ে যেতেই হবে। সেইদিন তার পাশে বসতে পেরেছি, এইটা নাকি আমার জন্যে বিশেষ সুযোগ, তার বদলে এখন ওকে ফুসকা খাওয়াতে হবে।

শুভ্রা বলল, আরে না। আমি বলি নাই। নিজেই বলল এখন নিজেই কথা ওল্টাচ্ছে।

মিতু বলল, এই তুই না বললি তোর জরুরি কাজ যেতেই হবে। আবার আসলি যে...

শুভ্রা বলল, ফুসকা জিনিসটা কেউ খেতে বললে তুই না করতে পারবি।

মিতু সম্মতি জানাল, সেটা অবশ্য একটা কথা। না বলা কঠিন।

মোরশেদ বলল, মিতু দেখি তুই আগে রেডি হতে পারিস নাকি আমি আগে। আমাকে কিন্তু একদম পুরাপুরি গোসল করতে হবে। বুঝে দেখিস।

মিতু বলল, বাবা তোমার যত তাড়া আমার তো তত তাড়া না। তাই না। আমি কেন তোমার সাথে এই কম্পিটিশনে যাব।

বাসা থেকে তিনজন নামছে। বেরিয়ে গাড়িতে উঠবে। মোরশেদ, মিতু আর শুভ্রা।

ঠিক এই সময় ফোন বাজে মিতুর। ফোনের দিকে তাকিয়ে মিতু বুঝল, ডা. জাকিরের কল।

সে ফোন তুলে বলল, হ্যালো।

একটা রিকশা থেকে ফোন করেছে জাকির।

জাকির বলল, হ্যালো মিতু তুমি কোথায়।

মিতু বলল, বাসার সামনে।

জাকির বলল, কোথাও যাচ্ছ? না ফিরছ।

মিতু বলল, কেন?

জাকির বলল, আমি তোমাদের বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। মনে হলো তোমাকে নিয়ে একটা জায়গায় যাবো। আছো কিছুক্ষণ!

মিতু ফোন মুখ থেকে সরিয়ে বলল, এই তোরা যা রে আমি যেতে পারতেছি না।

মোরশেদ ভ্রু কুচকে বলল, কেন?

মিতু বলল, আছে ব্যাপার। তোমরা যাও।

শুভ্রা আল্লাদি গলায় বলল, না, কেন?

মিতু বলল, সব কথা বলতে হবে? তোরা দুইজন যা। তোদের তো সুবিধাই করে দিচ্ছি।

মোরশেদ বলল, এইটা কী ধরনের ব্যাপার।

মিতু বলল, থাকতে পারে না মানুষের সমস্যা?

মোরশেদ আর শুভ্রা কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ির কাছে গেল।

এই সময় জাকির সাহেবের রিকশা এসে হাজির হয়। তাই দেখে শুভ্রা হাসতে থাকে। মোরশেদও।

শুভ্রা হাসি থামিয়ে বলল, চলেন মোরশেদ ভাই চলেন।

মোরশেদ বলল, আমি ডাক্তার সাহেবকেও সঙ্গে নিতে রাজি।

শুভ্রা বলল, কিন্তু ডাক্তার সাহেবকে তো রাজি থাকতে হবে। ভেজাল কইরেন না তো। চলেন।

শুভ্রা আর মোরশেদ শুভ্রাদের গাড়ির পেছনে উঠলে গাড়ি চলতে থাকে।

মিতু আর জাকির বাসার সামনে।

মিতু বলল, কই যেন যাবা বললা?

জাকির বলল, কই আর যাবো। চলো রিকশা ঘণ্টা চুক্তিতে ভাড়া করে ঘুরি।

মিতু বলল, চলো।।

একটা রিকশা দেখে জাকির হাত ইশারা করে– এই রিকশা যাবা। ঘণ্টা চুক্তি।

রিকশাওয়ালা তাদের জরিপ করে। তারপর বলে, ডাবল ভাড়া দিতে হইব।

জাকির বলল, ক্যান।

রিকশাওয়ালা বলল, আছে ব্যাপার।

জাকির বলল, ডাবল মানে কত।

রিকশাওয়ালা বলল, এক ঘণ্টা ১০০ টাকা।

জাকির বলল, আচ্ছা ষাট টাকা দিব চলো। সেইটাও তো ডাবলই হইল।

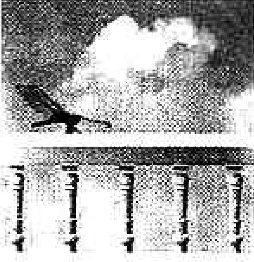
রিকশাওয়ালা বলল, তাইলে সারাক্ষণ চালাইতে পারুম না। মাঝেমধ্যে রেস্ট নিমু।

জাকির বলল, আচ্ছা তাই কোরো।

রিকশায় চড়ে ওরা ঘুরছে। পড়ন্ত বিকাল। চারদিকে লাল হয়ে আসা পাতাওয়ালা গাছ। একটু একটু কুয়াশার আমেজ। বাতাসে ধুলোও বেজায়।

একটা ফাঁকা জায়গায় রিকশা রেখে রিকশাওয়ালা বলে: আপনেরা গল্প করেন। আমি একটু জিরায়া আসি। রিকশা থাইকা নাইমা বেশি দূর যাইয়েন না জানি। তাইলে আবার রিকশা চুরি হইতে পারে।

রিকশাওয়ালা দূরে বসে জিরোয়। জাকির আর মিতু মন খুলে গল্প বলে। কত বিচিত্রই না তাদের কথা বলার বিষয়।



মুনিরের অফিসে আবার ফোন আসে তানিয়ার। তানিয়া জিজ্ঞেস করে, কী করো?

মুনির বলে, তুমি ফোন করছ? খবরদার আর কোনোদিনও করবা না।

সে ফোন রেখে দেয়।

তানিয়া আবার কল করে।

মুনির আবার রেখে দেয়। তানিয়া আবার করে। মুনির এবার কেটে দেয়। তানিয়া মোবাইলে করে। মুনির মোবাইল ফোনের ব্যাটারি খুলে ফেলে।

তানিয়া তখন তার মোবাইলে মেসেজ টাইপ করতে থাকে।

তানিয়া লেখে: কী হইছে। ফোন ধরতেছো না ক্যান। আমার উপরে রাগ? কেন?

অনেকক্ষণ পরে মোবাইল ফোনটা অন করলে তানিয়ার মেসেজ এসে পৌঁছায় মুনিরের মোবাইল সেটে।

আজকে বড় ঘুম পাচ্ছে মুনিরের। অফিসের চেয়ারে বসে ঘুমানোটা হাস্যকর হবে। সে চেয়ার থেকে উঠে নিজের কক্ষেই একটু পায়চারি করতে লাগল। এই সময় পিয়ন এসে বলল, স্যার। আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে আসছে।

মুনির হাই তুলতে তুলতে বলল, কে?

একজন ভদ্রমহিলা।

আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।

পিয়ন চলে যায়। তানিয়া আসে।

মুনির বিস্মিত। তানিয়াকে কেউ ভদ্রমহিলা বলবে, মুনির ভাবে নাই। সে চোখ সরু করে বলে, তুমি?

তানিয়া হাসে, হ্যাঁ।

এইভাবে অফিসে চলে এসেছো কেন?

কারণ এ ছাড়া আর কোনো অল্টারনেটিভ নাই। তুমি আমার ফোন ধরছ না কেন।

বসো। তোমার সাথে কথা আছে।

বলো।

তোমাকে আমার পেছনে ঠিক কে লাগিয়েছে বলো তো।

কেউ লাগায় নাই। আমি নিজে এসেছি।

কিন্তু আমি নিশ্চিত তোমাকে কেউ এসাইন করেছে। হয় আমার অফিসের কেউ। নইলে আমার বিজনেসের রাইভালদের কেউ।

নাহ্ মুনির। আমি তোমার কাছে এসেছি আমার নিজের গরজে। প্রথমে এসেছিলাম একটা এডে চান্স পাওয়ার জন্যে। মডেল হবার পথে তোমার হেল্প নেবার জন্যে। কিন্তু এখন এসেছি...

এখন এসেছ...

তোমাকে ভীষণ ভালো লেগে গেছে বলে।

মুনির হেসে ফেলল।

তানিয়া বলল, হাসছ যে?

মুনির বলল, ইউ আর আ ভেরি গুড একট্রেস। তোমার মডেলিঙে নয় অভিনয়ে যাওয়া উচিত। এখন যাও। অফিসে সিন ক্রিয়েট করো না।

মুনির। আই এম ইন লাভ উইথ ইউ। আই লাভ ইউ।

ওকে। থ্যাং ইউ ফর লাভিং মি। বাট আই এম নট দি রাইট পারসন টুবি লাভড। আমার বউ আছে। বাচ্চা আছে।

থাকুক। আমি তোমার বউ বাচ্চার কোনো ক্ষতি করছি না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে ভালোবেসেই যাবো।

হইছে। এখন যাও। এইটা অফিস।

না যাবো না। আগে তুমি বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো। তারপর যাবো।

যাও না রে বাবা।

না আগে বলো।

আচ্ছা যাও তো আগে। গেলে বলব।

বললে যাবো।

আচ্ছা বাসি যাও।

কী বাসো?

কী বাসি মানে?

ভালো বাসো নাকি মন্দ বাসো?

মন্দ বাসি।

তাইলে যাবো না।

আচ্ছা ভালো। এবার ওঠো।

ভালো তো?

হুঁ।

তানিয়া দ্রুত মুনিরের কাছে এসে ওর ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল।

জাকির আর মিতু বসে আছে ক্যাফে ম্যাংগোতে। ধানমণ্ডি ৩১ নম্বরের কাছে এই ক্যাফেটা সুন্দর। ছোট্ট কিন্তু সপ্রাণ।

জাকির বলল, মিতু। তোমার কি মনে হয় বলো তো। আমি লোকটা কেমন। লাভাবল নাকি না।

মিতু বলল, লাভাবল।

ক্যান ইউ লাভ মি দেন।

এভরিবডি ক্যান।

না, আমি পারটিকুলারলি তোমার কাছেই জানতে চাই।

কী?

তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

তুমি বাসো কিনা?

মনে হচ্ছে। আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি।

আমার কোনো আপত্তি নাই।

কিন্তু তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

আজকে বলব না। ঠিক সাতদিন পরে বলব।

সাতদিন পরে কেন?

আছে কারণ।

কী কারণ?

আছে। এখন বলব না।

আসলে মিতুর পেট ফেটে যাচ্ছে হ্যাঁ বলার জন্যে। কিন্তু একবারে হ্যাঁ বললে কেমন দেখায়, তাই সে জাকিরকে একটু ঘোরাচ্ছে। একেই কি বলে, বুক ফাটে, তবু মুখ ফোটে না!

মোরশেদের হাতে মিষ্টির প্যাকেট। সেটা নিয়ে বাসার সবার কাছে যাচ্ছে। মা মুখ খোলো। হা করো।

নুরজাহান বেগম বললেন, কেন। কী হইছে?

মোরশেদ বলল, আমি মোহামেডানে খেলছি। কন্ট্রাক্ট ফাইনাল।

সে মিনহাজুর রহমানের কাছে যায়। বাবা হা করো।

মিনহাজুর রহমান বলেন, কে।

বাবা আমি মোরশেদ। তোমার ছোটছেলে।

তোর আবার জন্ম হলো কবে।

সে বাবা একটা দিন তারিখ আছে। নাও আগে মিষ্টি খাও। আমি মোহামেডানে খেলছি। বোঝো তাহলে....

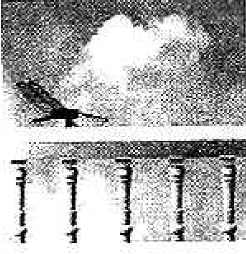
কলকাতায় খেলতে যাবি?

না বাবা ঢাকা মোহামেডান।

ভালো খুব ভালো।

এরপর মোরশেদ যায় লেখার কাছে। নে মিষ্টি খা। আর আমার অটোগ্রাফ নিয়ে রাখ। ফটোগ্রাফও নিয়ে রাখ। আমি মোহামেডানে জয়েন করেছি।

আঁকা চোখ গোল গোল করে তাকায়। ঘটনা কি সত্যি?



ডা. জাকির হাসপাতালে। ওয়ার্ডে তার ডিউটি পড়েছে। আজকে রোগীর সাক্ষাৎপ্রার্থীর ভিড়টা কম। টেলিভিশনে মনে হয় ক্রিকেট খেলা দেখাচ্ছে। সবাই খেলা নিয়ে মত্ত আজকে। দুপুরবেলা। রোগীরাও খেয়ে-দেয়ে বিছানায় গড়াচ্ছে।

জাকিরের মোবাইলে ফোন আসে।

ফোন করে জাকিরের মা। গ্রামে কোনো মুদির দোকানে মোবাইল ফোন আছে। দোকানের ওপরে এন্টেনা টাঙানো। সেই দোকানে মা একা গেছে। বাবা যায় নাই। যেহেতু জাকিরের বাবা-মা অবস্থাপন্ন সেহেতু মোবাইল ফোন বাড়িতেই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু নেট-ওয়ার্ক নাই বলে তাদের বাড়িতে এখনও মোবাইল ফোন নেওয়া হয়নি।

হ্যালো কে জাকির?

জাকির বলে, কে, মা?

বাবা। শোন। কেমন আছিস?

আছি মা। তোমরা কেমন আছ!

আছি। শোন তোর বাবার শরীরটা বেশি ভালো না।

কী হইছে বাবার?

না তেমন কিছু না। অস্থির হোস না। একা একা গঞ্জে গেছে। রিকশা থেকে পড়ে গেছল।

বলো কী! ফ্রাকচার হয় নাই তো!

না। তা হয় নাই। আছে ভালো।

বাবা কই?

তোর বাবা বাড়িতে।

ডাক্তার দেখাইছ। কেউ চেক করছে সব ঠিক আছে কিনা।

দেখছে। সুলতান ডাক্তার দেখে গেছে।

সুলতান ডাক্তার দেখলে হবে? শোনো। দেখি হসপিটাল থেকে ছুটি পেলে আমি চলে আসব।

আয় বাবা কবে আসবি?

দেখি যত তাড়াতাড়ি পারি।

আচ্ছা বাবা আয়। রাখি হ্যাঁ। ফোন তো করিস না।

করব মা।

ফোন রেখে জাকির হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকে।

জাকির ফোন করে মিতুকে।

মিতু আমি বাড়ি যাচ্ছি। আর বোলো না বাড়িতে বিরাট ঝামেলা হইছে। বাবা নাকি রিকশা থেকে পড়ে গেছল। কী অবস্থা আল্লাই জানে!

কবে যাবা?

এই বৃহস্পতিবারেই চলে যাই। শোনো। তোমার ৭দিন কবে পুরা হবে।

এই তো শনিবারে।

তুমি একটা কাজ করো। ডেটটা একদিন আগায়া আনো। বৃহস্পতিবারে করো। শনিবারে আমি তো বাড়িতে থাকব।

না। আমি শনিবারেই বলব। আপনি মোবাইলে ফোন দিয়েন।

সেইটা না হয় দিলাম। কিন্তু আমাকে একটা ধারণা দাও। তোমার ডিসিশনটা কি পজিটিভ হতে যাচ্ছে নাকি ...

না। ধারণা দিলে তো আর কী। আজকেই বলা হয়ে গেল।

খুবই ভয়ে ভয়ে আছি রে ভাই। পাস করি নাকি ফেইল করি?

গভীর রাত।

নিলুফার আর মুনিরের বেডরুম।

নিলুফার ঘুমিয়ে। মুনিরও। মুনিরের মাথার কাছে মোবাইল।

তানিয়া জেগে আছে তার ঘরে। তানিয়া মোবাইল তুলে নিয়ে মেসেজ পাঠায়।

jaan ki karo? Ghumao? (জান কী করো। ঘুমাও?)

মুনিরের শিয়রের কাছে মোবাইলে মেসেজ আসার টু টু শব্দ হয়।

মুনিরের ঘুম ভেঙে যায়। সে মোবাইল নিয়ে মেসেজ চেক করে।

তারপর নিলুফারের দিকে তাকায়। নিলুফার ঘুমে।

মুনির আস্তে করে বিছানা ছাড়ে। বাথরুমে যায়। সেখান থেকে সে মেসেজ পাঠায়।

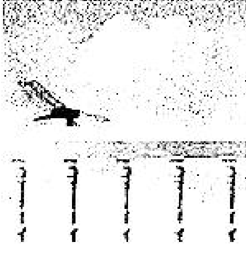
তুমি কী করো? মুনির লেখে।

তোমাকে নিয়ে ভাবি।

আমাকে নিয়ে এত ভাবার দরকার নাই। তুমি ঘুমাও।

তোমাকে ছাড়া আমি ঘুমাতে পারব না। তুমি আসো। তানিয়া লেখে।

জাকির গ্রামে গেছে। আর ফিরছে না। মিতুর পাগল হবার দশা। শনিবারে জাকিরের ফোন করার কথা ছিল। জাকির ফোন করে নাই। সে আফসোস করে মরছে। কেন যে সেদিনই জাকিরকে হ্যাঁ বলে ফেলল না। যদি জাকির আর না আসে?



এই পরিবারের গল্পটি শেষ হয় না। কোন পরিবারের গল্পই বা শেষ হয়।

তবে এই পরিবারের গল্পটি শুরু হয় তখন যখন নিলুফার জানতে পারে, তার স্বামী মুনির আরেকটা বিয়ে করেছে। মেয়ের বয়স ২২। সে বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তার নাম তানিয়া। পুরো তথ্যটাই আসে ফোনে।

নিলুফার কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি।

কিন্তু দুঃসংবাদ চাপা থাকে না। একটার পর একটা ফোন আসে। মুনির তার বউকে নিয়ে কোথায় আলাদা বাসা করে থাকে, সবই বিশদভাবে তাকে জানানো হয়।

মুনিরকে জিজ্ঞেস করলে সে হ্যাঁও বলে না, নাও বলে না।

শেষে মোরশেদকে নিয়ে একদিন নিলুফার বেরিয়ে পড়ে মুনিরের নতুন সংসারের সন্ধানে। ঠিকানা মিলিয়ে গেলে তারা ঠিকই একটা ফ্লাটে পৌঁছয়। নিচতলার ইন্টারকম ফোন থেকে কল করে মোরশেদ। একজন মেয়ের গলা আসে প্রথমে। মোরশেদ বলে, মুনির ভাইকে দেন।

নারীকণ্ঠ বলে, মুনির তোমাকে চায়।

হ্যালো, মুনিরের গলা।

মোরশেদ বলে, ভাইয়া, আমি মোরশেদ।

মুনির বলে, আয় ভেতরে আয়।

মোরশেদ বলে, ভেতরে ডাকে। তুমি যাবা।

নিলুফার বলে, না, তুমি যাও। দেখে আসো।

মোরশেদ ভেতরে গেলে নিলুফার প্রার্থনা করতে থাকে যেন জনরব মিথ্যা হয়। যেন এটা মুনিরের নতুন সংসার না হয়।

মোরশেদ ফিরে আসে দ্রুতই। বলে, চলো।

কী দেখলা।

চলো বাসায় চলো।

ট্যাক্সিতে সারাটা পথ নিলুফার চোখের জল ফেলে।

সামনে তার মেয়ে লেখার এসএসসি পরীক্ষা।

আর নিলুফারের যাবারও কোনো জায়গা নাই।

তার বাবা এখন বাসায়। তিনি যদি জানেন লিজা এই বাড়িতে এসেছিল, তাহলেই তিনি ক্রুসেডে নামবেন।

নুরজাহান বেগম বড়ছেলের ওপরে রাগ করেছেন। কিন্তু তিনি বাস্তববাদী। পুরো সংসারটা চলছে মুনিরের আয়ে। তিনি তো মুনিরকে বাসা থেকে বের করেও দিতে পারেন না।

কী হবে এখন? কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ স্বামী আরেকটা বিয়ে করেছে জানার পরেও তার বাড়িতে আশ্রিতের মতো থাকতে পারে?

আহা। যদি সে লেখাপড়াটা শেষ করতে পারত, আজকে একটা চাকরি অন্তত করতে পারত। এখন, এই বয়সে কেইবা তাকে চাকরি দেবে? কয়টাকা বেতন পাবে সে? সেই টাকায় সে কি একটা বাসা ভাড়া নিতে পারবে? আঁকা আর লেখা থাকবে কার সঙ্গে?

কী করবে লেখা, যখন সে জানবে সব ঘটনা?

নিলুফারের মাথা খারাপ হতে থাকে। খুব খারাপ। সে একগাছা দড়ি হাতে কি যাবে ফ্যানের দিকে।

মা। আঁকা ডাকছে। মা, হোমওয়ার্ক পারছি না। হেল্প করো।

দুপুরবেলা। চারদিক নিস্তব্ধ। দূরে একটা ফেরিওয়ালা পুরোনো কাগজ বলে ডাকছে। মাঝে-মধ্যে মিনহাজুর রহমানের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, কে যায়? নিলুফারের মনে পড়ে যায়, এমনি দুপুর নামত তাদের তেজগাঁর বাড়িতেও। সে আর এলি তখন চুপচুপ করে যেত পুকুরঘাটে।

পুকুরের জলে এক টুকরো করে পাতা ছুঁড়ে মারত।

বুলবুলি পাখি লাফাত জবার ডালে।

আর এক ঝাঁক পুঁটি মাছ কাছে এসে দুপুরের রোদে ডানা পেটের

ঝলক দেখাত।

মা মা, আমি আর পারছি না। আমাকে নিয়ে যাও। নিলুফার তার মাকে ডাকে। মা মারা গেছেন কিছুদিন হলো।

সে কি মায়ের কাছে চলে যাবে?

মা, তোমাকে না বললাম হোম ওয়ার্ক করে দিতে। আঁকা আবার উঁকি দিল।

